ইটখানি তাহাদের দান? আমরা যে লক্ষ্যে চলিয়াছি, রুষ, জার্ম্মান ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, জাপান—নিখিল জগত-প্রবাহ যে সাগরের বুকের টানে চলিয়াছে, তাহার তুলনায় স্বাধীনতাও যে পথ। মানুষ দেবতা হইবে; রূপে মধুতে, সোহাগে সম্পদে, অন্তর-লাবণী ও জ্ঞানে মানুষ যে পরশমণি পাইবে, তাহার অঙ্গ-বিভাই যে সর্ব্ববিধ মুক্তি।

পথকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলে, তাই পথের পথিক এত দিন তোমাদের পথ দেখাইয়া চলিত—তোমাদের নেতা হইত। কিন্তু সে পথের যে তাহারা দুই দশ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র চেনে, শতপদ ব্যবধান মাত্র গিয়া বলে, "আর জানি না"; হয়তো বা পথ বলিয়া বিপথেই লইয়া যায়। সমগ্র রাস্তাটি চলিয়া কিন্তু যে আলোর দেশে পৌঁছিতে হয় সেই সবটুকু যে চেনে সেই তোমাদের দিশারী, সেই ত চিরসঙ্গী। সে সঙ্গী যে সঙ্গেই আছে, শুধু চিনিয়াও চিনিলে না, এমন সুহৃদকে দেখিয়াও দেখিলে না। যাহাকে আমরা মনের মানুষ করিয়া অন্তরের সাধ আশার সহিত মিলাইয়া পাই, জাতীয়জীবনে সেই ত পারের মাঝি হইয়া প্রকট হয়। শতপদের দিশারীর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে একদিন সমস্ত পথের—লক্ষ্যের দিশারীকে খুঁজিয়া পাইবে। জাতীয় জীবনের মণ্ডল-বেদীতে যে দিন সে আসিয়া মধুহাস্যে স্বর্গের চাঁদ হাতে দিবার সাহসে দাঁড়াইবে, সে দিন দেশে মাঠের চাষী পথের ভিখারী হইতে রাজতক্তের রাজা অবধি তাহাকে চিনিবে, বলিয়া উঠিবে, "এই ত সে এসেছে, আমার অন্তর বাহিরের ডাকের মানুষ ত এসেছে।"

তোমায় শুধু এংলো-স্থানের ইঙ্গবঙ্গ চেনে, আমায় শুধু বাবু স্থানের নকল-নবিশ চেনে। কারণ আমরা ভারতের সাধনার প্রতিমা নই। গান্ধী যাহার পূর্ব্বাভাষ, সে যে এখনও আসে নাই। সাগরের সেই অকূলে পাড়ি জমাইবার নেয়ে আসিবে, ভাই আসিবে, তাহার তরী ভিড়াইবার ঘাট যে তোমাদের সবারই আঙ্গিনায়।

অগ্রহায়ণে নববর্ষের সংখ্যা হইতে বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রের আত্মকথা ক্রমশঃ বাহির হইবে। নাঃ সঃ।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল।

অপূর্ব্ব আগমনী।

[শ্রীকালিদাস রায়]

দোলায় চড়ে' আয় জননী
রোদনে তোর বোধন বাজে।
অট্টহাসির কোলাহলে
আয় এ ভীষণ শ্মশান মাঝে,
(তুই) শ্মশান ভাল বাসিস্ বলি
করলি এদেশ শ্মশানস্থলী
কুকুর শৃগাল ভূত প্রেত পাল
পেত্নী পিশাচ হেথায় রাজে।
(রচি) মড়ার কাঁথায় আসনটি তোর
ভাঙা কলস নেচে বাজাই,
গাঁথি মহাশঙ্খ মালা
করোটিতে অর্ঘ্য সাজাই।
শ্মশান ভরা শবের পরি
রুদ্রাণী তো'র বরণ করি
আয় মা এবার মহাকালী
ছিন্নমস্তা তারার সাজে॥

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্য।

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ,]

শুনিয়াছি বড় মামা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া মেডেল পাইলে চারি পাশের গাঁয়ের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাংলায় এমন একটা দিন যে ছিল আজকালকার আপিসে আপিসে তাড়া-খাওয়া গ্রাজুয়েটের দল বোধ হয় স্বপ্নেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম গ্র্যাজুয়েট হইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ দুঃখের পথ উন্মুক্ত করেন—তখন নাকি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে গ্র্যাজুয়েট দলে দলে বাহির হইতেছে—অথচ একটাও তোপ পড়িল না দেখিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে বকেয়া তোপগুলি একসঙ্গে দাগিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পাশ হইলে গাঁয়ের লোক জড় হওয়া বা গ্র্যাজুয়েট হইলে তোপ পড়ার যুগ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও যায় নাই। নিরন্ন পাদপের দেশে এরণ্ডও দ্রুম বলিয়া গণ্য হয়, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর ছড়াছড়ি—সবাই যদি সম্রাট হয়, তবে পদাতিক বা কে, আর প্রজাই বা কে? বাংলাদেশের রাজ্যবিহীন রাজা মহারাজার ন্যায় এই সকল সম্রাটকে সকল সময়েই ঋণের পিরামিডের মাথায় বসিয়া উঁচু হইতে হয়। সুখের বিষয় দেশের লোক জানে না—তাঁহারা কোথা হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন; অবশ্য তাঁহারাও বুদ্ধিমানের মত স্বীকার করেন না—কোন্ ধনাগার হইতে এই সম্পদ ধার করিয়া লইয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্য-সেবার প্রাইজ পশ্চিমের সরস্বতী টাকা হিসাবে বেশ মোটা কিছুই দিয়াছেন—দরিদ্রের জাতি, অত গুলি টাকা এক জায়গায় দেখিয়া আনন্দে আমাদের পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক দেশে মাত্র একজন ব্যারিষ্টার ছিল—পাড়াগাঁ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত;—কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে আসিলে এই প্রশংসমান পল্লীবাসীদের বিস্ময়-সূচক হাঁ-টা বোধ হয় এত বিস্তৃত হইত যে তাহাতে বঙ্গ ভঙ্গের মত মুখে একটা compound fracture হইয়া তাহাদের বাঁচিবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকিত না।

"তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন"

আমাদের দেশের সাহিত্য বলিয়া তাহাকে আদর করি, প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার সেবা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আসল ব্যাপারটা কি তাহাও হুঁস থাকা দরকার। সে খেয়াল না থাকিলে দ্রুমজীবনে এরণ্ড হইয়াই কাটাইতে হইবে। আমরা চোখ বুঁজিয়া এই ভাবিয়া বসিয়া আছি যে ভারতের মধ্যে আমরাই অগ্রসর জাতি—ভারতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সাহিত্য-গুরু আমরা। কিন্তু প্রদীপের নীচে কতটা অন্ধকার সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের দীপটি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে দীপালি উৎসবের আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে—আমরা আমাদের অচলায়তনের কোণে শিবরাত্রির সলিতাটি লইয়াই বসিয়া আছি।

বিশ্বসাহিত্যে আমরা কি দিয়াছি? রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কোন্ সাহিত্যরথী, বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছেন? আমাদের সাহিত্য-সম্রাটগণ সবই 'স্বদেশে পূজ্যতে';—'সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এমন সাহিত্যিক চাই, যিনি বিশ্বমানবের মর্ম্মের অন্তস্তম স্থলটিতে আঘাত করিয়া বাঙালীর নিজস্ব সুরটিকে জগতের করিয়া দিবেন। বাংলার সে সেক্‌সপীয়র, গেটে, টলষ্টয় এখনো তো আসিল না!

আমাদের নিজের প্রাণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই। তাই ঠিক সুরটি ধ্বনিত হইতেছে না। কি একটা বেসুরো অবাস্তবতায় আমাদের সাহিত্য মূক হইয়া রহিয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাংলার মুদীর দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানও রামায়ণের রচনায় নিজকে কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের একতার প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে যে সাহিত্যে, সে ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী রাম প্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা মাঠ প্লাবিয়া রাখালের গলায় ধ্বনিত হয়, আবার কর্ম্মরত গৃহস্থের ব্যস্ত-জীবনের মাঝে বৈরাগীর খোল করতাল, বাউল ফকিরের একতারার সঙ্গে আসিয়া খানিকক্ষণের জন্য জীবনের দূর লক্ষ্যের আবছায়া চিত্রটা মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে আমাদের সে সাহিত্য কই?

ইংরেজী ভাবে তৈরী, ইংরেজী সভ্যতার by-productদের জন্য একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা ধনীর গৃহে শূন্যে ঝোলানো সুন্দর

আগাছার মতই শোভা পাইতেছে। দেশের মাটীতে তাহার শিকড় নাই—তাহার মাথাটা নীচের দিকে আর গোড়াটা উপরে। মালীর জলদানে তাহার পুষ্টি; ভানুর পবিত্র কিরণ ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া তাহার গায়ে কালেভদ্রে লাগে—বাহিরের উন্মুক্ত হাওয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহাকে কখনো কখনো দোলায়—আকাশের বৃষ্টি হয় তো কোনো দিন অসাবধানতায় খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার গায়ে ছাট দেয়—নিশার শিশির তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই নিরস্ত হয়, প্রকৃত সে মণির মত উজ্জ্বল ঢল ঢল অলঙ্কার তাহার মাথায় পরায় না—আমাদের সাহিত্যের আজ এই অবস্থা।

সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই।

ধর্ম্মের ন্যায়, স্মৃতির ন্যায়, বিদ্যার ন্যায় সাহিত্যেরও একটা শিক্ষা দিবার কাজ আছে। The object of writing a story is story-writing—গল্পলেখার সার্থকতা গল্পলেখাতেই এ সব কথা paradoxএর জন্য শুনিতে ভাল এবং বলাও বোধ হয় সেই কারণেই হয়। কিন্তু চরমে সাহিত্যের একটা উদ্দেশ্য তো আছে। সাহিত্যিকের নিকট সাহিত্য সৃষ্টি শুধু বাহে পাওয়ার মত, ক্ষিদে পাওয়ার মত—একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাহার ভিতর আর্ট আছে, চেষ্টা আছে, ভাব আছে। থিয়েটারে ষ্টেজে দাঁড়াইয়া অভিনেতা যেমন দর্শকগুলিকে সামনে রাখিয়া অভিনয় করেন, সাহিত্যিকও পাঠকবর্গের হাততালির দিকে কাণ খাড়া রাখিয়া লিখিয়া থাকেন। সোণালি উষায় গলা ফুলাইয়া স্ফূর্ত্তির জ্বালায় পাগল দোয়েলের মত আপন মনে গান করিবারই যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শাহারার মরুস্থানে কিম্বা আমেরিকার জঙ্গলে সাহিত্যিকদিগের জন্য একটা penal settlement বন্দী উপনিবেশ করিলেই ভাল হয়। লিখিয়া ছাপানই বা কেন? আর বিজ্ঞাপন দেওয়াই বা কেন? এ পর্য্যন্ত তো শুনিলাম না যে কোনো সাহিত্যিক নিজের গীতটি ছাপাইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন? অথবা ঠোঙা ঠোঙা সন্দেশ খাওয়াইয়া লোক ধরিয়া নিজের গীতটি শুনাইতেছেন? তাই সাহিত্য শুধু subjective বা অন্তরের নয়, সে একটা বহির্জগত বা objectএর নিকট তাহার সার্থকতা পাইতে চায়! কবি নিজে কবিতা লিখিলেই তৃপ্ত হন না—জগৎকে শুনাইয়া তৃপ্ত হইতে চান। জগৎকে যখন শুনাইতে চান—তখন জগৎ কি চায়, সেটাও একটু মনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে বই কি।

অবশ্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল পাত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক বিশ্বমানবের

চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবে। তাহার সৃষ্ট চরিত্র হয় তো স্মৃতিশাস্ত্র বা সমাজের আইন মাফিক না হইতে পারে। না হওয়াই স্বাভাবিক, মানুষের জন্মটাও তাহাকে পরামর্শ করিয়া হয় নাই, তাহার জীবনটাও লজিকের যুক্তি অনুসারে চলে না। সে মানুষ—একটা আস্ত জ্যান্ত জানোয়ার এবং লজিকের syllogism নয় বলিয়াই—তাহার জীবনটা এই একটা পাগলের খেয়ালের মত রহস্যের মত হইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যের অন্তরালে উঁকি মারিতে গিয়া বিফল চেষ্টায় যে সৌন্দর্য্যরসের অবতারণা—তাহাই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে এই সকলের কথা খুব কমই আছে। নাটক, নভেল এবং কবিতার ভরে বাংলা সাহিত্য যায় যায় হইয়াছে। নাটকের চরিত্র গুলি যেমন অস্বাভাবিক, অভিনয়ও তদ্রূপ। যে নায়কের চরিত্র ভাল সে একবারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত—ভাজা মাছখানি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া খাইতে জানে না—আবার যাহার চরিত্র খারাপ সে একেবারেই সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। যেন স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক স্বর্গ নরকের উপযুক্ত করিয়া ইহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃষভের মত সুর হইলেই বীররস হইল, আর নাকি সুরে প্যাঁ প্যাঁ করিতে পারিলেই করুণ রস—আর কাতুকুতু দিয়া কোন গতিকে হাস্যরস জাগাইতে পারিলেই, শ্রেষ্ঠ নাটককার!

একটা মেস, একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী ও লম্পট একটা ছোকরাই আমাদের নভেলগুলির পুঁজি। বেদেরা যেমন একটা ভালুক, একটা রামছাগল, আর একটা মর্কট লইয়া বাজি দেখাইয়া পয়সা উপায় করে—আমাদের নভেল লেখাও কতকটা সেই ধরণের। এতদিন কলিকাতার মেসে থাকিলাম—ঠাকুর চাকরের আদর যত্নে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইবার উপক্রম করিল—কিন্তু পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন "লভ্" করিবার সুযোগ পাইয়া এ নীরস জীবনটা সরস হইতে পাইল না তো! আমাদের সমাজ শাসিত বৈচিত্র্যহীন জীবনে 'লভের' অবসর নাই, তাই কলিকাতায় আনিয়া মেসে ফেলিয়া লভ্ ঘটাইতে হইবে-ই—না হইলে যে plotটা খাড়া হয় না। পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল সমস্যা জীবন্ত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে—বার্নার্ড বা হাউপ্‌টমান প্রভৃতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সকল সমস্যার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনে কোর্টসিপ নাই, elopement নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাই, সধবা বিবাহও নাই, divorce নাই, যুদ্ধ নাই, রাজ্য

নাই,—সমাজ বিপ্লব নাই—কি লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম—সে আর কত রকমে লেখা যাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধার করা আইডিয়া লইতে হয়—কিন্তু বাঙলার মাটিতে সে গুলি নিতান্ত আগাছার মতই রহিয়া যাইতেছে।

জাতীয় জীবনের, সমাজ জীবনের প্রসার না হইলে, চঞ্চলতা না আসিলে, সমস্যা দেখা দিবে না—সমস্যা না আসিলে যুগ সাহিত্যের আবির্ভাব হইবে না।

কবিতার ভিতর দিয়া আমাদের সাহিত্য ফুটে নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই পশ্চিমের পাকা শিষ্য। মিল্টন, বায়রণ, সেলি প্রভৃতির ভূত এই সকল লেখার পিছন হইতে উঁকি মারে। Sublime conception আমাদের সাহিত্যে নাই—Lyric genius বা গীতি-কবিত্ব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক স্থলেই হরিনাম ফোড়ন দিয়া টপ্পা গাহিয়া আমরা সে গীতি-প্রতিভা নিঃশেষ করিয়াছি। রাধা কৃষ্ণ না জন্মাইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন কবির পেশা উঠিয়া যাইত।

"সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি।"

আমাদের কবিতার সম্বল এই কয়টি। আমাদের জাতের চরিত্র যেমন হালকা, সাহিত্যও তেমনি হালকা। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন ইহা কাঁচা বয়সের লক্ষণ—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহা ইঁচোড়ে পাকার লক্ষণ। এই কাঁচা অবস্থায় পাকা বন্ধ করিতে হইবে। বাঙলার সাহিত্য-প্রতিভা চিরন্তন শাশ্বত রসের অনুগামী সাহিত্যের সৃষ্টি করুক। তৃষ্ণাতুর পথিককে শুধু এক গেলাস ঘোলের সরবৎ না দিয়া তাহাকে স্বর্গের অমৃতবারি দানে তৃপ্ত করুক। দু'দিনের কথা ভুলিয়া চিরসত্য, বিশ্বজনীনকে অবলম্বন করিয়া মানব জীবনের এবং জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হোক—তবেই আমাদের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে, জগতের নিকট আমাদের মা আদৃত হইবেন, বিজয়ের বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া আবার আমরা অমৃতের অধিকারী হইব।

পতিতা।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

নয়নের জলে হৃদয়-শোণিতে
লিখন লিখেছি আজি,
ব্যথার কুসুমে দেবতা পূজিতে
ভরিয়া এনেছি সাজি;
সরমের বাঁধ ভেঙ্গেছে আজিকে
অশ্রু-সাগর-বান,
মরমের সাধ প্রাণের কাহিনী
গাহিব খুলিয়া প্রাণ।

তোমরা শুনিবে ওগো জ্ঞানী গুণী
আমার প্রাণের কথা?—
পাপের অঙ্কে হীনতা-পঙ্কে
লুপ্ত মরম-ব্যথা?
তোমরা বুঝিবে এ প্রাণের জ্বালা
কলঙ্ক-কালী-মাখা
সারা জীবনের নয়নের জলে
নিবিবে না যার শিখা?

অভাব-দৈন্যে স্বভাব হারায়ে
পাসরিয়া মান-লাজে
জনমি মানবী কবে যে কেমনে
সাজিনু দানবী-সাজে!
সমাজ-দেউল- নির্ব্বাসিতার
—সে কথায় কার কাজ?—

জ্বালাময় পাপ জীবনের কথা
ব্যক্ত করিব আজ।

হেথায় আসিয়া একি দেখি হায়
একি ঘোর পরিহাস!
সমাজের যারা মাথার মাণিক
তাদের হেথায় বাস!
দিনের আলোকে রক্ত-তিলকে
যাদের ললাট শোভে;
রাতের আঁধারে পাপের সাগরে
তারাই আবার ডোবে!

রূপের বেসাতি মেলায়ে বসেছি
রূপ নিয়ে বেচা-কেনা;
এ দেহ বিকায়ে ধর্ম্ম লুকায়ে
শুধিছি পাপের দেনা।
এ রূপের হাটে লালসার কড়ি
কাহারা জোগায়, জান?
সমাজের নাটে যারা নটবর
যাদের তোমরা মান

আমরা অধম, আমরা পতিতা,
আমরা ঘৃণার পাত্রী!
নরকের আলো জ্বেলেছি এ ভবে
আমরা নরক-যাত্রী!
এ নরক-পথ সুগম করিয়া
কে দেয় তাহা কি জান?
ধন-মান-শীলে কুলীন বলিয়া
যাদের তোমরা মান!

সভার মাঝারে আমাদের নামে
নয়নে বহ্নি ছুটে;
গোপনে লুকায়ে এ চরণ-তলে
তাহারাই এসে লুটে!
দিবসে মোদের নয়নে হেরিলে
কুঞ্চিত হয় দেহ;
নিশীথে মোদের পরশ লাগিয়া
কতই তাঁদের লেহ!

তাহাদের হাতে শাসন-দণ্ড
বিধাতার প্রতিনিধি;
সমাজ-সাগর মন্থন-ধন
তাহারা অমল নিধি!
সে সব রতনে অনেক যতনে
ধরেছ তোমরা বুকে;
তাদের আদেশ বহিয়া মাথায়
যাপিছ জীবন সুখে।

বারেকের তরে এ জীবনে ভুল
করিল না কেহ ক্ষমা;
মুছায়ে অশ্রু ধরিল না হাত
স্নেহ—দয়া নিরুপমা!
পিচ্ছল পথে হাসিতে হাসিতে
ঠেলিল মোদের সবে,
পাপের পঙ্কে ডুবায়ে ধরিল
কৌতুক-হাসি রবে।

একবার যদি আঁধার ঘুচায়ে
জ্বালাতে জ্ঞানের দীপ,
ঘৃণার কালিমা মুছায়ে ললাটে
পরাতে স্নেহের টীপ;

সারাটি জীবন তোমাদের সেবা
সাধনা মোদের হ'ত,
সফলতা লভি' পূর্ণ হইত
বিফল জীবন-ব্রত।

এ প্রাণের জ্বালা তোমাদের হায়
জানাইয়া কিবা ফল ?
পাষাণ গলিবে তোমরা হাসিবে
হেরি এ চোখের জল !
বারেক তোমরা ভাবিলে না মনে
রহিল মনের খেদ,
পাপ-পুণ্যের সীমারেখা কোথা
সাধু অসাধুর ভেদ !

আমাদের ঘৃণা করিবার আগে
একবার ভেবে দেখ
যদি বাকী থাকে নয়নের কোণে
এক ফোঁটা জল-রেখ।

অনন্তানন্দের পত্র।

যে বার প্রথম গুজরাতে যাই তোমার মনে আছে ? গাড়ীতে জনকত গুজরাতী ব্রাহ্মণ, কয়েকজন মারাঠী আর বাকি হিন্দুস্থানী। একা আমিই সবেধন নীলমণি বাঙ্গালী। গাড়ীতে গল্প বেশ জমে এসেছে। একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ মালা জপ করতে করতে শোনাচ্ছিলেন যে তাঁর ছেলে না ভাইপো গায়কবাড়ের রাজ্যের একজন মস্ত আফিসার। মালার একটী দানা দেখিয়ে বল্লেন যে সেটী আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ; এক গিনার পাহাড়

ছাড়া সে রকমটী আর ভূ-ভারতে অন্য কোথাও পাবার জো নেই। সেটী ধরে একলক্ষ বার জপ করলেই হয় মহাদেব, না হয় নন্দী, অভাবপক্ষে মহাদেবের ষাঁড়টি এসে হাজির হবেনই হবেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁর কথায় সায় দিয়ে বল্লে যে অযোধ্যাজীতে ঘেঁটুরাম বাবাজীর আখড়ায় ঠিক ঐ রকম আর একটী রুদ্রাক্ষ আছে। বাবাজী নাকি তীর্থভ্রমণ করতে করতে আবু পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে বাবাজীর সেবায় তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ ঠাকুরের এক চেলা বাবাজীকে এ রুদ্রাক্ষটী বথ্‌সিস করেন। প্রতি সোমবার আর শুক্রবার পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে রুদ্রাক্ষটীর পূজা করতে হয়; আর তার এমনি মহিমা যে কোন ছোট জাত যদি সেটীকে চোখে দেখে ত চৌদ্দ দিন, না হয়, চৌদ্দ মাস, না হয় চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে সে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবেই যাবে।

পাশেই আর এক গুজরাতী ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে গুন্ গুন্ করে ভজন গান করছিলেন। হিন্দুস্থানীর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বল্লেন—'দেখ্‌লে! তবু আজকাল লোক ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না।

গাড়ী সেই সময় একটা ষ্টেসনে এসে লাগতেই জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাপড় [illegible] একটী লোক গাড়ীতে ঢুকে চুপ করে এক পাশে এসে দাঁড়াল। অ[illegible]র মালাধারী গুজরাতী পুরুষ তাকে নিজের ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলেন [illegible]তে পারলুম না। বেচারা উত্তর করলে—"মাড়"। তার পর ভানুমতীর ভোজ-বাজীর মত যে অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটল তা' না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু'জন গুজরাতী তড়াং কোরে লাফিয়ে একেবারে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়লেন। তাঁদের মাথার পাগড়ী গুলো গড়াতে গড়াতে আরও পাঁচ সাত হাত এগিয়ে গেলো। যিনি ভজন গাচ্ছিলেন তাঁর ভক্তির উৎস একদম্ বন্ধ হয়ে গেল। "আরে রামঃ" বলে হুঙ্কার করেই তিনি পাশের গাড়ীতে টপ্‌কে পড়লেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর দলও গাড়ী খালি কোরে যে যে দিকে পারলে অন্য গাড়ীতে পালালো।

যে লোকটী গাড়ীর এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি ? লোকটী বললে—'বাবুজী, আমি মাড়'। তখন মনে পড়ে গেল যে বোম্বাই অঞ্চলে মাড়েরা অস্পৃশ্য জাতি। তাই বেচারা গাড়িতে উঠতেই সবাই আপনার আপনার জাত আর ধর্ম্ম বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল। কোথায় গির্ণার, কোথায় আবু পাহাড় ঘুরে ঘুরে ধার্ম্মিকেরা যা' কিছু

পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, আজ একটা 'মাড়ে'র সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তা'ত আর নষ্ট করতে পারেন না! 'মাড়' বেচারাকে টেনে আমার কাছে বসাতে ধার্ম্মিকেরা আমার দিকে এমনি দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন যেন আমি এই মাত্র চিড়িয়াখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।

সেদিন আমার চোখের সুমুখ থেকে একখানা পর্দ্দা সরে গেল। ছেলেবেলা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বার সময় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কাছে এসেই আমার বিধাতার উপর ভারি রাগ হতো। মনে হতো—হায়, হায়! ওদিন পাঠানেরা না জিতে যদি মারাঠারা জিততো! আজ কিন্তু মাড়ের দুর্দ্দশা দেখে মনে হলো পাণিপথে মারাঠারা জিতলে ভারতে বর্গীদের রাজ্য হতো বটে—কিন্তু তা' হলে আজ এই ক'জন ধার্ম্মিক পুরুষ মিলে মাড় বেচারাকে গাড়ী থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতো। ন্যায়াধীশ রাম, শাস্ত্রীও তার সুবিচার করতেন কি না সন্দেহ! নিজের অঙ্গকে পঙ্গু করতে আমাদের জোড়া মেলা ভার!

আর এ রোগ কি শুধু বর্গীদের? বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, হিন্দুস্থান—এক চেয়ে আর সরেশ; এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। আলমোরায় এক সাধুদের মঠে একবার বসে আছি, এমন সময় এক পাদরীসাহেব তাঁর কতকগুলি দেশী শিষ্য সমেত সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে ১৪।১৫ বৎসরের একটী ছেলে ছিল। সে যে কি মোহে পড়ে খৃষ্টান হয়েছে তা' জানবার আমার ভারি কৌতূহল হ'লো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ কথা ও কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা, তোমার বাড়ীতে কি মা বাপ নেই? তুমি ধর্ম্মের কি বুঝেছ যে হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যা বলে ছাড়তে গেলে?" ছেলেটী একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—"বাবাজী, ধর্ম্মের আমি কিছুই জানিনে। আমার মা বাপই আমাকে খ্রীষ্টান করে দিয়েছে। প্রায় বছর দুই হ'ল আমি একবার বড়দিনের সময় পাদ্‌রীসাহেবদের আড্ডায় বেড়াতে যাই, পাদ্‌রীসাহেব আমায় আদর করে খাবার খেতে দেন। খেয়ে দেয়ে আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বললাম—'মা, আমি পাদরী সাহেবদের বাড়ী খানা খেয়ে এসেছি।' মা শুনে কাঁদতে লাগলেন, বাবা বললেন আমার নাকি ধর্ম্ম চলে গেছে; আমায় আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে আর কোথায় যাই? সেই অবধি পাদরীসাহেবের সঙ্গেই আছি।"

দেশাচারের ভয়ে যে সমাজে মা বাপের মন থেকেও দয়া মায়া স্নেহ মমতা শুকিয়ে গেছে, সে সমাজ সজীব না মরা? মরা বললে আবার বন্ধুরা চটে উঠেন,

তাঁরা বলেন যে সমাজকে অমন ব্যাং খোঁচানি না করে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করতে হয়। তাঁরা এ কথা বুঝেন না যে যাদুর গায়ে হাত বুলাবার সময় আর নেই। এ তো বুদ্ধির অভাব নয়, এ যে প্রাণের অভাব। যারা জ্ঞানপাপী তাদের বুঝিয়ে কিছু হবে না। দুঃখ-যন্ত্রণার তাপে গলিয়ে তাদের নূতন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করতে হবে। পুরাণ বচনের বনিয়াদ উপড়ে ফেলে সত্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নূতন সমাজ গড়তে হবে। এখন যা' আছে এ তো ধর্ম্ম নয়; ধর্ম্মের ভ্যাংচানি; পারলৌকিক স্বার্থপরতা; নিজেদের ক্ষুদে ক্ষুদে স্বার্থের পুঁটলির উপর বড় বড় নামের ছাপ মেরে ধর্ম্মের বাজারে ভাল মাল বলে চালান করবার চেষ্টা। হায় রে, ভগবান কি এমনই বোকা যে দু'টো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তা' যদি হ'তো, ত এই হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে গুঁতোর উপর গুঁতো বর্ষণ হচ্ছে কেন? শাস্ত্রে লেখে ধর্ম্মের ফল সুখ। আমরা যদি এত বড় ধার্ম্মিক ত আমাদের লাঞ্ছনা আর দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি নেই কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো, কৃমির মত বুকে হেঁটে মরছি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্য কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্য মেঠাই মোণ্ডায় বরাদ্দ করে দেবেন, একথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপা পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

আমাদের দেশের ছেলেরা তাই ধর্ম্ম আর কর্ম্মের দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। যে সব আচার অনুষ্ঠান সনাতন ধর্ম্মের মুখোস পরে আমাদের বুকের উপর বসে গলা টিপে দম বন্ধ করবার জোগাড় করে তুলেছে, সে গুলির মধ্যে যে সনাতনত্বের একান্ত অভাব এ কথা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে। ধর্ম্ম যে নাক টেপাটিপি বা নাড়ী শোধনের কসরৎ নয়, সাড়ে সতর কাহন কড়ি দিয়ে তা' যে ভট্টাচার্য্য মশায়দের দোকানে কেনা যায় না, ধর্ম্মের চাপে মানুষের আড়ষ্ট বা আধমরা হয়ে উঠা যে একান্ত আবশ্যক নয়, ডিগবাজী খেতে খেতে ভবপারে ছিট্‌কে পড়াই যে ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এ কথা যতদিন লোকে না বুঝবে ততদিন ধর্ম্মের আর কর্ম্মের সামঞ্জস্য যে কি করে হ'বে তা' ত খুঁজে পাই নে। পদি পিসির ধর্ম্ম দিয়ে যাঁরা ছেলেদের পেট ভরাতে চান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে যাঁরা অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেন, শূদ্রস্পৃষ্ট হলে যাঁরা ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে তবে জাতে তুলে নেন, তাঁরা

যে ধর্ম্ম মন্দিরের পাহারাওলার ব্যবসা সহজে ছাড়বেন, তা' ত মনে হয় না। তবে আশা এই যে ভগবানের একটী নাম দর্পহারী। মানুষ আপনার চারিদিকে অহঙ্কারের বেড়া দিয়ে রেখেছে—একদিন না একদিন তিনি তা উপড়ে ভেঙ্গে ফেলে দেবেন। সারা জগৎজুড়ে ভাঙনের মড়মড়ানি শোনা যাচ্ছে, এ দেশও কি বাদ পড়বে?

আগমনী।

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

ওই দেখ নাথ! শরৎ এসেছে
দুধের ঢেউ মাখি',
কাশের গুচ্ছ শাদা মেঘ গুলি,
ফেলে নদীকূল ঢাকি।
কেটে গেল গোটা একটি বছর,
তিনটি দিনের দেহ অবসর,—
মাতার আনন, পিতার চরণ
কেমনে না দেখে' থাকি!
স্বর্ণের রথে শরৎ এসেছে
দুগ্ধের ঢেউ মাখি'।

পথ চেয়ে চেয়ে বসে' বসে' মাতা
ফেলিছে আঁখির লোর!
বৈরাগী তুমি, বুঝিবে কেমনে
মরমের ক্ষত মোর!
পাষাণ বাপেরও গণ্ড বহিয়া
অশ্রু নিঝর পড়িছে ঝরিয়া,
প্রাণ খানি সারা বেঁধেছে যে তা'রা
দিয়ে শোনিতের ডোর!

পথ চেয়ে মাতা দিন গণে আর
ফেলে নয়নের লোর!

চাল কড়ি দিয়া শোধ কি গিয়াছে
জনকের সেই ঋণ!
মায়ের মুখটি মেয়ের মনে যে
পড়িতেছে নিশিদিন!
হিমালয়-পথে, ঘাটে, বনে গাছে
শত পাকে মন জড়াইয়া আছে,
এখনো বাহুতে রাঙা শাঁখা দু'টি
আছে সেথাকার চিন্!
চাল কড়ি দিয়া শোধ কি গো হয়
জনকের সেই ঋণ!

অভিমানী ফুল—শেফালী ফুটিয়া
লুটিয়া পড়িছে ধূলে,
আশা অপেক্ষায় ভারতবাসীরা
রয়েছে নয়ন তুলে।
শরতের হাওয়া, শরতের গান,
সাড়া দিয়ে যেন চেতাইছে প্রাণ,
মন্ত্র পড়িয়া হিন্দুরা করে
বোধন বিল্ব-মূলে।
অভিমানী ওই দুলালী শেফালী
লুটিয়া পড়িছে ধূলে!

বঙ্গ দেশের কৃষক কুলের
হরষের সীমা নাহি,
স্বর্ণ ক্ষেতের আল পথে তা'রা
ফিরে আগমনী গাহি'!

মোর অন্নের থালা নিয়ে তা'রা
বণ্টন করে ঘুরে পাড়া-পাড়া,
খালি হাতে শেষে কাঙালের বেশে
থাকে মোর পথ চাহি'।
মাটির মানুষ কৃষক কুলের
হরষের সীমা নাহি!

বুড়ো বরে পড়ে তাই হ'ল মোরে
এতখানি হতাদর!
মনে পড়ে সেই মায়ের কান্না,
আঁখি দুটি ঝর—ঝর্।
খাও গিয়ে ভাঙ্, মাখ ছাই গায়,
যাও যথা তথা যেথা মন ধায়,
তিন দিন তবু মায়ে ঝিয়ে দু'য়ে
জুড়াইব অন্তর!
বুড়ো বরে পড়ে' জানিনা যে হ'বে
এতখানি হতাদর!

ধর্ম্ম কি সত্যই বাধা?

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রাবণের নারায়ণে "ধর্ম্মের বাধা" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া—

"গান শুনে গান মনে পড়ে—
অশ্রুপাতে চোখে আসে জল"

(কামিনী রায়)

আমারও গোটাকতক কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই এই আলোচনার অবতারণা।

তাঁর প্রবন্ধের নামটী পড়িয়াই হয়তো অনেকে চমকাইবেন—কারণ ধর্ম্ম যাহা তাহাতে ত মানুষকে ধারণই করে বাঁচাইয়াই রাখে, তাহা কি কখন বাধা স্বরূপ হইতে পারে? যাহার মূল বার্ত্তাই হইল এই মরণধর্ম্মীদের মধ্যে অনন্ত জীবনের সংবাদ আনিয়া দেওয়া, তাহাই হইল জীবন পথের বাধা!

কিন্তু এমনি মানুষের মন, এমনি তাহার আন্তরিক স্থিতিশীলতা যে যাহা সে একবার ধরিয়াছে তাহা সে সহজে ছাড়িতে চায় না। চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের লীলা পরিবর্ত্তনের "আনন্দ-কোলাহল, তবু সে অবুঝের মত চোখ ঢাকিয়া বলে না—না কিছু না, ওসব ভুল মায়া মিথ্যা। সত্য কেবল আমি যাহাকে অবলম্বন করিয়া আছি তাহাই!" পলে পলে তাহার স্কন্ধস্থ সতীদেহের গলিত অংশ কালের বিষ্ণুচক্রে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবু তাহার সংজ্ঞা নাই। আর যদিই বা সংজ্ঞা হইল, তখন সে তিন চক্ষু এক করিয়া যোগস্থ হইয়া বসিল। হায়রে মায়া! হায়রে ভয়! যাহা গতিশীল তাহাকে গতি বলিয়া স্বীকার না করাই যে তাহাকে না পাওয়া। যার নাম জগৎ তাহার "ধর্ম্মই" হইল ত গম্ ধাতু হইতে। অথচ এমনি ত মানুষের, বিশেষতঃ এই ধার্ম্মিক দেশের ধার্ম্মিক মানুষের, মন যে সেই ধর্ম্মকেই করিয়া তুলিল স্থাণু, অচল, স্থিতিশীল। এখন এই অচল পাথরের বিশাল মৃত ঠাকুরটী তাহাকে আপন পায়ের ভারে কোন্ পাতালে পাঠাইবে কে বলিতে পারে?

যাক, অতুল বাবুর প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য এই যে কাহারও কাহারও মতে আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জাতি। সেই আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যেই আমরা আমাদের দৃষ্টি Dickensএর Bleak Houseএর Mrs Jellibyর মত দূর অতীন্দ্রিয় লোকের উপর নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছি। এদিকে সমস্ত ভোগ, ঐশ্বর্য্য সম্পদের যে প্রকাণ্ড হাট আমাদের ছিল তাহা দিনে দিনে ভাঙ্গিয়া কালস্রোতে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে,—

এ শুধু উষর বালুকা ধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া!" (রবীন্দ্র)

তাই তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে এখন আমাদের দৃষ্টিটা অধ্যাত্ম জগতের দূর নক্ষত্র লোক হইতে নামাইয়া প্রতিদিনকার নিতান্তই ডালভাতের জগতের উপর ফেলিতে হইবে।

তাঁহার মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমার কোন অমিল না থাকিলেও যাহা তিনি আমাদের জাতীয় অপটুতার আর নির্জ্জীবতার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন সেই বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

তিনি বলিয়াছেন যে আমরা আধ্যাত্মিক জাতি। ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা সর্ব্ববিষয়ে চিরাদন আধ্যাত্মিক ছিলাম কিনা এখন সে কথা তুলিতে চাই না, কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুতেই ত নিজেদের আধ্যাত্মিক বলিতে পারি না। যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিদ্রায় কাটাইতেছে তাহারা যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহা হইলে তেলাপোকাও পাখী—এবং ভেকও হস্তীর স্বজাতি।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আত্মবোধ জিনিষটা কি এতই সহজলভ্য যে দু'বেলা আধপেটা খাইয়া এবং উপরওয়ালার বুটের ঠোক্কর নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া বলিব যে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং", যাঁহাকে জানিলে আতমৃত্যুকে হস্তামলকবৎ পাওয়া হয়।

না—আধ্যাত্মিকতা এই দুর্ব্বল প্রাণহীন জাতির নিকট হইতে দূরে অতিদূরে চলিয়া গিয়াছে। কবে যে গিয়াছে জানিনা, তবে এইটুকু জানি যে এই প্রাণহীণ শবদেহে আত্মা আর বাস করেন না। এই অশুচি অপবিত্র শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরই আছে, ভূত প্রেতই আছে, পিশাচ যাতুধানই আছে, দেবতা নাই। এখন এই শ্মশানে যাঁহারা সাধক হইবেন তাঁহাদিগকে শব-সাধনার সমস্ত ভয় সমস্ত বিপদের মধ্যে বসিয়া মহাশক্তির সাধনা দ্বারা এই শবকেই শিবে পরিণত করিতে হইবে; এই শবের মধ্যেই প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। এই পথে উত্তর সাধক থাকে ভালই, না থাকে তবু "সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া" তাহাকেই অস্বীকার করিয়া প্রাণকে জাগাইতে হইবে। মহাশক্তির আবির্ভাবে প্রাণের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের শাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ আছে তাহার প্রথম বর্গ ই হইতেছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের পর অর্থ, অর্থের পর কাম, কামের পর মোক্ষ। অর্থ আর কামকে, ধর্ম্ম আর মোক্ষের মধ্যে রাখার একটা অর্থ আছে—অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। অর্থ আর কাম যদি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং পরিশেষে যদি ঐ দুই বস্তু মোক্ষের মধ্যে আপনাদিগকে লীন না করে তাহা হইলে তাহাদের যে কি ভয়ঙ্কর ফল হয় তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক সভ্যতা। এই ভদ্রবেশী বর্ব্বর সভ্যতা অর্থকে পরমার্থ এবং কাম পূরণকে পুরুষার্থ করিয়া যে বিপদ ঘটাইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বুঝাইবার দরকার নাই। কিন্তু আমাদের

জীবনের আদর্শ বোধ হয় এই ছিল, যে আগে ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া নিজের জীবনের গোড়াপত্তন স্থির ভূমির উপর করিয়া লও। তার পর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কামনা পূরণ কর। তারপর নিজের চারিদিকে যে স্বকৃত বন্ধন জুটাইয়াছ, কামনা পূরণের সেই স্বকৃত বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হও। যাহার বন্ধন বোধ নাই, তাহার পক্ষে মোক্ষের অনুভূতিই আছে কিনা সন্দেহ। যে বন্ধন তুমি সৃষ্টি করিবে, তাহা যদি প্রথম হইতে সজ্ঞানে স্বকৃত বলিয়া অনুভব করিতে করিতে নিজের চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তাহা কখনই পূর্ণ বন্ধনের হেতু হইবে না। সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বতন সুধিগণ অর্থ আর কামের আগে পিছে ধর্ম্ম আর মোক্ষকে চৌকি দিবার জন্য বসাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম জিনিষটা বাঁধে বটে, কিন্তু সজ্ঞানে। অজ্ঞানের ধর্ম্ম নাই, অন্ততঃ ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অজ্ঞানের নয়। আমাদের ধর্ম্ম যতদিন জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যতদিন স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্য্য গুরুগৃহ বাসাদি দ্বারা, জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা, জীবনের প্রারম্ভকে কুসংস্কারমুক্ত, প্রাণপূর্ণ শক্তিশালী করিয়া লওয়া হইত ততদিন ধর্ম্ম শাস্ত্রকারাগারে বদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিককেও অন্ধতামিস্রের মধ্যে আবদ্ধ করে নাই। ধর্ম্মের প্রধান কার্য্যই ছিল আত্মার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করিয়া দেওয়া। তাই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই আপন আপন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনের পূর্ব্বে দ্বিজ হইয়া অজ্ঞতার পশুজন্ম হইতে জ্ঞানের বীরজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে সংসারে অর্থ ও কামের পূরণের জন্য প্রবেশ করিতেন। কিন্তু মূলের সেই যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সেই আত্মাভিমুখী গতি চিরদিনই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে আত্মার মুক্তির সুরটুকু লাগাইয়াই রাখিত। তাই তাঁহারা ভোগের মধ্যেও আত্মাকে—নিত্যমুক্ত বুদ্ধস্বভাবকে অনুভব করিতেন, ত্যাগের মধ্যেও করিতেন। তাই তাঁহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন এই আত্মার পূর্ণ শক্তিকে অনুভব করিতেন তখন মোক্ষের দিকে মুখ ফিরাইতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের কর্ম্ম ছিল ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্ম ছিল মোক্ষের জন্য। এবং সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে আত্মানুভূতির সুখ থাকার দরুণ কোন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হয় নাই। তাই তাঁরাই ছিলেন আধ্যাত্মিক যাঁহারা—

"কোনো খানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সকল বিশ্ব করেছেন ভেদ।" (রবীন্দ্র)

কিন্তু আজিকার দিনে এই অর্দ্ধমৃত তমঃপ্রকৃতির কর্ম্মবিমুখ জাতিকে যদি আধ্যাত্মিক বলা হয় তাহা হইলে "আধ্যাত্মিক" কথাটার এমন অপমান করা

হইবে, যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমস্ত আধ্যাত্মিকেরাই লজ্জিত হইবেন।

শুধু কোনো গতিকে প্রাণ ধারণ করাই যদি গৌরবের কারণ হয় তাহা হইলে এখনো অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রাকৃপ্লাবনিক জীব জগতে বাঁচিয়া আছে! তাহারাও তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার দাবী করিতে পারে!

যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্রদেহ, এবং সেই দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া কোনো বৃহত্তর ভাবকেই আপনাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে অনুভূতিময়, প্রসারণশীল, বিস্ফোৎসারী সর্ব্বংসহ আত্মা নামক মহাশক্তি-শালী কিছু আছে এ কথা বলিলে সকলেই হাসিবে।

যখন এই জাতির আত্মজ্ঞান ছিল তখন ইহার দেহে মনে প্রাণে শক্তিও ছিল। বৈদিক যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত অন্ধ্রাদির ক্ষত্রিয় যুগের মধ্য দিয়া মুসলমানগণের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে সময় আমরা প্রবলভাবে ভোগী, সেই সময়ই আমরা প্রবলভাবে ত্যাগী। যখন আমরা সমুদ্রযাত্রা করিয়া সুমাত্রা যাভা চীন জাপান হইতে বাণিজ্য সম্ভারে দেশলক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি, তখনি আমরা অন্তরের ধ্যানসাগরে পরমাত্মকূলের উদ্দেশে জীবাত্মাকে সাধন-তরণীতে প্রেরণ করিয়াছি। সহস্র কর্ম্ম যখন আমাদিগকে অজগরের মত শত পাকে বেষ্টন করিয়াছে সেই সময় বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ কুমারিল্ল চৈতন্য নানক কবির জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত বন্ধনকে অবহেলায় ছেদন করিয়াছেন। তখন কর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মের বাধা স্বরূপ হয় নাই, ধ্যান আমাদের কর্ম্মের সহায়ক হইয়াছে, আচার আমাদের আত্মাকে পাঁকে না ডুবাইয়া পূত পবিত্র করিয়া সমস্ত বিপদ বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য শক্তিশালী করিয়াছে। যখন আমাদের আত্মা ছিল, তখন ধর্ম্মও ছিল, কর্ম্মও ছিল—তাই তখনি আমাদের ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই শিল্প, তখনকার বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্তই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তাই তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত খুঁড়িয়া গুহা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই কঠিন প্রস্তর হইতেই দেবতাকে খুঁদিয়া বাহির করিয়াছি, আবার যম নিয়মের কঠোতার মধ্যদিয়া গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং যিনি তাঁহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। তখন যিনি রাজা ছিলেন তিনি বিশ্ববিজয়ও করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে বিশ্বজিৎ কিমিচ্ছক ব্রত করিয়া সমস্ত রাজ্যের সহিত রাজমুকুটও দান করিয়া শ্মশানে চণ্ডালের কর্ম্মকেও বরণ করিয়াছেন, না

হয় বৈরাগীর পীত বস্ত্র, রক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই শ্রুতি বাক্য সফল করিয়াছেন। বৈশ্যও তখন "ত্যাগায় সম্বৃতার্থ" হইয়া বৈরাগীর ভিক্ষা পাত্রে শ্রাবস্তিপুরের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য সমস্তই দান করিয়াছে। যখন অর্জ্জুনের শক্তি ছিল, তখন দান করিয়াছি, এখনকার মত "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া ত্যাগ ধর্ম্মকে ভেঙ্গচাই নাই।

আত্মার স্বভাব দুই,—আপনাকে জানা এবং আপনাকে ছড়াইয়া দেওয়া। দুই কার্য্যেই শক্তি চাই এবং শক্তির প্রয়োগের দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রের সংঘর্ষে আত্মার স্বানুভব বৃত্তি চরিতার্থ হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া আত্মা আপনাকে জানিতে পারে এবং এই জানাই আনন্দ। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আপনাকে কুড়াইয়া পাওয়াই আনন্দ। আবার এই কুড়াইতে হইলেই ছড়াইতে হয়, আপনাকে দিতে হয়; এই দানেও আনন্দ। কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া, সেই ছড়ান আপনাকে কুড়াইতে হয়। এই ছড়ান এবং কুড়ান হইতে আত্মার দুই স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সে এই রূপেই বুঝিতে পারে যে, সে এক সঙ্গে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, ভোক্তা এবং ভোগ্য, 'অণোরনীয়ান্' অথচ 'মহতো মহীয়ান্'। সে এক সঙ্গে একবারে একক অচল একরূপ ও সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ সচল বহুরূপ এবং পরম স্থূল। সে এক সঙ্গেই গুহামুখে এক এবং বহির্মুখে বহু।

আত্মা একদিকে যেমন অচলপ্রতিষ্ঠ, অপরদিকে তেমনি নিত্য-চঞ্চল নিত্য-পরিণামী। একদিকে সে সর্ব্বকারণকারণং রূপে তুরীয়, আবার আর একদিকে কার্য্যরূপে লোকে লোকে কালে কালে বহুধা প্রবহমাণ। সাগর যেমন আপনার মধ্যে স্থির অথচ কোটী কোটী স্রোতে ও তরঙ্গে, লক্ষ লক্ষ স্থান ভেদে বহুধা বিভক্ত, আত্মাও তেমনি ব্রহ্মভাবে একেবারে অচ্যুত, অপরিণামী, আবার জগৎ-ভাবে সদা পরিণামী।

আত্মার এই দুই ভাবকে এককালে এক সঙ্গে না স্বীকার করিলে তাঁহাকেই অস্বীকার করা হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন বশতঃ ইহার এক দিকটাকে, অচল অপরিণামী দিকটাকেই স্বীকার করিয়া জগৎপ্রপঞ্চকে শশ-বিষাণের ন্যায় বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তেমনি আত্মার কেবলমাত্র পরিণামিত্বকেই স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান জগৎ-সর্ব্বস্বই হইয়া উঠিয়াছে।

সত্য ঠিক এই উভয়কে ধরিয়াই বসিয়া আছেন। তিনি অচলও বটেন সচলও বটেন,—সদাগতি কালের দিক হইতে তিনি সদা ক্ষর, সদা পরিণামী অথচ কালাতীত ভাবে তিনি অক্ষর। আবার দেশ ভাবে তিনি অনন্ত কোটী জড়ে

জীবে বিভক্ত হইয়া আছেন, অথচ ব্রহ্মভাবে তিনি দেশাতীত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরমাত্মায় এই দুই বিরোধী তত্ত্ব একত্র আছে বলিয়াই তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্যেন্দ্রিয়ং বস্তু। জীব যখন সমাধিদ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে তখন সে বুঝিতে পারে সকল প্রকার বিরোধী গুণই তাহাতে আছে। এবং তখনই সে সতেজে বলে যে ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।

জীব তখনি আধ্যাত্মিক পদবাচ্য হইতে পারে যখন সে ধর্ম্মে মুক্ত, কর্ম্মে মুক্ত, জ্ঞানে মুক্ত, যখন সকল কর্ম্মেই তাহার আত্মাকে জাগ্রত করে, সকল ধর্ম্মই তাহার মূলধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ ভাবকে জাগায় এবং তাহার সমস্ত জ্ঞান তাহার মূল জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সূত্রে 'মণিগণাইব', গাঁথিয়া উঠে। সে যখন পূর্ণভাবে অভয়কে প্রাপ্ত হয় তখনি সে আধ্যাত্মিক। আত্মার পক্ষে ভয়ই প্রধান বাধা, তাই সে যখন ভয়ানাং-ভয়ংকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তখন সে আধ্যাত্মিক। এবং তখনি তার পূর্ণ ত্যাগের সঙ্গে পূর্ণ ভোগ আরম্ভ হয়। অন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগই হয় রাজস না হয় তামস। সে সমস্ত ত্যাগ বন্ধনেরই কারণ, কারণ তাহাতে দুঃখ এবং জড়ত্বকেই আনয়ন করে, আপনার স্বরূপকে আবৃত করে।

যে ত্যাগ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ত্যাগে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রকাশস্বভাব সাত্ত্বিক ত্যাগ। নহিলে "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া ত্যাগ করিলে তাহাতে আত্মারও তৃপ্তি হয় না, মনেরও স্বস্তিলাভ হয় না। তাহাতে জড়তা আসিয়া মনকে তিক্তরসে পূর্ণ করিয়া আত্মাকে অবসন্ন করে। আমরা যে 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টি'র বড়াই করি, তাহা ঐ 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'-রই নামান্তর মাত্র। বলিরাজা যতক্ষণ অহংকার তৃপ্তির জন্য দান করিতেছিলেন ততক্ষণ ত্যাগের ফল যে পরমার্থলাভ তাহা তাঁহার হয় নাই। তিনি যখন অহংকারকে ত্যাগ করিয়া আত্মাকে পরমাত্মার পদে পূর্ণভাবে দান করিলেন, তখনই বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহাই আপনার শীর্ষদেশে অর্থাৎ আপনার আত্মার মধ্যে পাইলেন। সেই সময় হইতেই সেই পরমাত্মা তাঁহার দুয়ারে দ্বারী হইয়া রহিলেন। বলিরাজ বলী ছিলেন বলিয়াই এই পূর্ণত্যাগে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

আত্মাকে যদি হৃদয়গুহাশায়ী জীবনারায়ণ বলিয়াই ধরা যায় তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে যে দুর্ব্বলের কাছে সে নিজেই নিজে অস্তিত্বহীন। তাহার আত্মোপলব্ধিই নাই—সে নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিজেকেই জানিতে পারে না। মন

বলিতেছে 'এই কর্ম্ম কর', কিন্তু ভয় বলিতেছে, 'পারিব না'; যাহার মনে এইরূপ ভাব প্রবল সে যে কি করিয়া আপনাকে জানিবে তাহা বুঝিতে পারি না।

এই জন্য বলিতেছি যে ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ. এই কথাটার অর্থ আমরা ভুলিয়াছি। আত্মার যাহা ভোগ, তাহা ত্যাগই; কারণ আত্মার একটা স্বভাবই হইতেছে ব্যাপকতা। বহির্মুখে সে সমস্ত জগতের উপর আপনাকে ছড়াইয়া সমস্ত জগতের সুখ দুঃখ আনন্দের মধ্যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া এক কথায় সমস্ত জগৎকে আত্মলীন করিয়াই সে অত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে। এই জন্যই ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই শ্রুতি বলিতেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ ঈশা বা পরমাত্মার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত কর, তারপর ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।

ধনের ভোগই যেমন ধনের ব্যয়, তেমনি এই পরমধন আত্মার ভোগই হইতেছে ত্যাগ। কিন্তু এই ত্যাগ কখন সম্ভব?—যখন সমস্ত জগতের উপর সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানাদির উপর আত্মবোধ ছড়াইয়াছে তখনি।

কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, সর্ব্বজ্ঞানলোলুপ, সদাজাগ্রত কোথায় সেই আত্মবোধ? কোথায় সে আধ্যাত্মিকতা যাহাতে আমাদের পূর্ণত্যাগী পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ করিবে? কোথায় হে কোথায়! প্রতিধ্বনিও বলিতেছে কোথায় গো কোথায়?

অতুলবাবু বলিয়াছেন যে আমাদের ধর্ম্মই জাতীয় গতিপথে বাধা স্বরূপ হইয়াছে। আমি বলিতেছি তাহা নয়। ধর্ম্ম এই হতভাগ্য দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাই এই মরণোন্মুখ অবস্থা। যাহারা পরের দুঃখ দূরের কথা, নিজের দুঃখই পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারে না, দৈহিক সামাজিক এবং জাতীয় সকল রকম দুঃখ যাহারা নির্ব্বিবাদে ভ্রান্ত সাত্ত্বিকতার দোহাই দিয়া সহ্য করিতেছে, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলা আধ্যাত্মিক বলা শুধু যে বাক্যের অপব্যবহার তাহা নহে, আমাদের চিরন্তন জাতীয় সাধনারই অপমান। যাহারা এই চিরবহমান কালকে কেবল অতীতের মধ্যেই দেখিতে পায়, যাহারা সম্মুখের চক্ষু দুটাই বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, যাহারা জানে না যে আমরা প্রতিনিয়ত সমস্ত অতীতকে বহন করিয়া বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, যাহারা পঞ্চানন শিবের কেবল পঞ্চমমুখ ঊর্দ্ধমুখটাকেই মুখ বলে, অন্য মুখগুলি মুখই নয় বলিয়া যাহাদের ধারণা, সেই Lotus catersএর দলের মধ্যে যে দিন

রুদ্ররূপী কালাত্মা জাগিবেন, সে দিনকার সেই দক্ষযজ্ঞের দারুণ দুর্দ্দিনে যদি ছাগমুণ্ড পাইয়াও ইহারা বাঁচিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। সেদিন এই ত্রিকাল-সত্য জগতের কঠিনত্বের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে তাহাদের মাথাটা না গুঁড়া হইয়া যায়, ত্রিকালসত্য আত্মার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

তাই আজ এই ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন দেশে, এই পরমদীনতার পরম হীনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া কাতর ভাবে বলিতেছি, হে আত্মা, হে জগৎপ্রাণ, হে জগৎশক্তি, হে বিশ্বসাগরশায়ী তুমি এস, আর আমাদের পক্ষে ঘুমাইয়া থাকিও না। জাগ হে, নাথ, জাগ—আমাদের পথ দেখাও, আমাদের ভবিষ্যৎকে চোখের সম্মুখে ধর।—

সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে,
কে করে এই তটিনী পারাপার?
অকূল হতে এসগো আজি কুলে,
দু'কুল দিয়া বাঁধগো পারাবার,—
ধর্ম্ম আর কর্ম্ম সাবধানী
উড়ায়ে দিবে উতলা করা বাণী।

সাধু হরিদাস ও পতিতা।

[শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।]

ওগো ও সাধক বর,—
তোমারে মজাতে পাপের ছলনে
একি ব্যথা আজ বেজে ওঠে প্রাণে,
সারা দেহ মোর কি জানি কেন গো
কাঁপিতেছে থর থর।

কি জানি আবেগ ভরে,—
আঁখি দুটী মোর আসিছে মুদিয়া
সব ছলা কলা যেতেছি ভুলিয়া,
অবনত শির লুটাইতে চাহে—
ও দুটী চরণ পরে।

কে যেন বাজায়ে বাঁশী,—
আয় আয় করি ডাকিছে আমারে
বৃন্দাবনের কুঞ্জ-দুয়ারে—
যমুনার জলে সিনান করিতে
ভাবের লহরে ভাসি।—

একি নব ভাবোদয়,—
গুমরি' গুমরি' মরমের তারে
ওই নব সুর বাজে বারে বারে
এ কিরে পরাণ-গলান রাগিণী—
চারিধারে মোর বয়।—

ও কি গো মধুর নাম—
কণ্ঠে তোমার উঠিছে কেবল
ভাবেতে বিভল চোখে বহে জল
গোলোক হইতে অমৃত যেন রে—
ঝরিতেছে অবিরাম।—

আর না ফিরিব ঘরে,—
দেহ অনুমতি ওগো মহাজন
লুটাইতে হেথা পাপ তনু মন
ও দুটী চরণ সেবিতে কেবল
রাখিয়া—মাথার পরে।

করিবে কি মোরে ক্ষমা ?
আমি যে ধরার কলুষ আঁধার
পাপেতে মানবে টানি অনিবার
আমি যে ঘৃণিতা ডাকিনী সমান
আমি যে অধমতমা।

ধীরে ধীরে বলে সাধু হরিদাস—
শান্ত মুরতি খানি,—
তোমার মতন ভকত নেহারি
আপনা ধন্য মানি,—
"এসগো জননী কুটীরে আমার
যশোদার রূপ ধরি,
স্নেহের পীযূষে সন্তানে তব
দেও গো হৃদয় ভরি।"

দিশারী বা নেতা কে ?

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

আজ রাজনীতির আসরে মহাত্মা গান্ধীর জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। তিনটি মত এ আসরে ঠেলাঠেলি করছে, কেউ বলছেন, "রাজা যা' দিয়েছেন তাই নাও, তার পর আরও চাও" ; কেউ বা বলছেন, "না, যেটা রাজা দিয়েছেন, সেটাকে বাগিয়ে ধরে ঠেঙ্গা করে তাই দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে রাজার কাছ থেকে আরও অধিকার বের কর" ; আর তৃতীয় দল অর্থাৎ মহাত্মার দল বলছেন, "কিছু নিও না, রাজার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বস, তা' হ'লেই কারে পড়ে রাজা সেধে পুরো স্বরাজ্য দিয়ে যাবে"। এই তিনটি মতের মধ্যে জাতীয় সভার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর মত—বর্জ্জন নীতিরই জয় হয়েছে।

একটা মুমূর্ষু জাত বেঁচে উঠে যতটা নড়ে চড়ে হাত পা ছোঁড়ে, সবটাই

তার জীবনের লক্ষণ। কোনটাই ব্যর্থ যায় না, দুর্ব্বল দেহে জীবনের নব প্রবাহ উষ্ণ রক্তের প্রথম গতি ঐ রকম নাড়া দিয়ে যায়, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অস্বাভাবিক হলেও, লক্ষ্যের হিসেবে তার অনেক খানি ব্যর্থ হলেও সেটা চাই। একটি মেয়ের একমাত্র নাড়ীছেঁড়া ধন মরেছিল, সে সেই অবধি কাঁদে নি, চুপ করে বসে থাকতো। ডাক্তার দেখে মেয়ের মাকে বলেছিল, "যদি মেয়েকে না হারাতে চাও, ওকে ধরে ওর বুকে খুব মারো, ব্যথা দিয়ে কাঁদিয়ে দাও।" অসাড়তা মৃত্যুর লক্ষণ, কান্না হাসি ছটোপাটি ছুটাছুটি জীবনের চিহ্ন। এ জাতটার সর্ব্ব-অঙ্গ ভরে সাড় এসেছে, এইটুকু হ'লো আশার কথা।

কিন্তু শৈশবে যা' সাজে, যৌবনে তা সাজে না। রাজনীতিতে আমরা কি আজও বালক ? পঞ্জাব হিন্দুস্থান মধ্যপ্রদেশ আর দেশের মুসলমান আজ এই প্রথম রাজনীতি শিখছেন, তাই তাঁদের এত মাতামাতি ঢলাঢলি, বোতল বগলে রাজপথে এত হল্লা সাজে। ওদের বোধ হয় ওটা চাই, কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে দেশ বলে একটা টান রক্তে মাংসে অস্থি মজ্জায় চারিয়ে যাওয়া চাই। মহামতি কর্জ্জন বাঁচিয়ে ছিল বাঙ্গলাকে, ডায়ার আজ বাঁচালো পাঞ্জাবকে। তোমরা মণ্টেগু সাহেবের স্তুতি কর, আসলেও মণ্টেগু সাহেব মন্দ লোক নন। কিন্তু আমার মতে লর্ড কর্জ্জন ও জেনারাল ডায়ারের মত সুহৃদ আমি ত আর দেখি না। ডায়ার সুচিকিৎসকের মত অসাড় মায়ের বুকে মেরে মেরে ব্যথা দিয়ে এ জাতটাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। তাই আজ মা ছেলের মর্ম্ম বুঝেছে—মা কি না এই সমষ্টিবদ্ধ দেশ-আত্মা আজ সন্তানের কল্যাণে তাই দশভুজা।

কবি রবীন্দ্র নাথ বিলাতে গিয়ে চেষ্টা করছেন যাতে মণ্টেগু সাহেব ভারতের বড় লাট হয়ে সুব্যবস্থা করতে এ দেশে আসেন। রবীন্দ্র কবি, প্রেমিক, শান্তির সাধক ; তাঁর প্রেরণাও সত্য। বিশ্ব নিয়ন্তার বাঁশীর সুর কত রন্ধ্রে, কত সপ্তকে বাজছে, তার সব কি আমরা ধরতে পারি। কিন্তু এখনও এ জাতি ভাল করে বেঁচে ওঠে নি, আর বাঁচবার উপায় ব্যথা দুঃখ দারিদ্র্য -- কষাঘাত। সুখের ঠাকুর, মঙ্গলময় ভগবানকে সেই চেনে যে তাঁর হাতের কাজ মাথায় নিতে পেরেছে। ব্যথা পেয়ে পেয়ে, আগুনে জ্বলে সুখশয্যা ছেড়ে তোমাদের মানুষ হ'তে হবে। তবে তো তোমরা প্রেমের একছত্রা মহারাজ্য গড়বে। যে ঘুমের মাতাল, এখনও চোখ থেকে যার তন্দ্রা ঘোচে নি, তার মাথার তলায় উপাধান দিতে নাই ; তার গায়ে হাত বুলিয়ে চামর ঢুলালে সে আবার ঘুমে ঢলে পড়বে। সুখ যে আমাদের সয় না, দুঃখই সয়। আজ রুষ জার্ম্মান্ ফ্রান্স ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড আমেরিক'

—বিশ্ব ভূভারত জুড়ে বেদনার সাড়া গুমরে গুমরে উঠছে, তোমরা সুখ নেবে কেন? এখনও যে পশুকে মানুষ হ'তে হ'বে, মানুষকে দেবতার কোঠায় উঠতে হবে; এখনও যে দুঃখ-সুন্দর ঘরে ঘরে বিষের বাটীতে করে অমৃত বিলাচ্ছেন।

এখনও তোমাদের হৃৎপিণ্ড ফেটে টস্ টস্ করে রক্ত ত পড়ে নি। তোমরা কাঁদ, সে যে সভা করে সখের কান্না, যাত্রার কৌশল্যা সেজে প্যালা কুড়োবার লোভে রামবনবাসের সেই বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না। সে দিন শ্রীযুক্ত আশু চৌধুরীর কাছে একজন মাড়ওয়াড়া বলছিল, "তুম লোক সাহেব বেওকুফ্ হো, নন্-কো অপারেশন জবান সে পাস কর দেও, পিছে চাহে কুছ মৎ করো"—তোমরা বাবু বেকুফ, নন্-কো অপারেশন পাস ত করে দাও, শেষে না হয় কিছুই কোরো না।" আর একজন মাড়ওয়াড়ীকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "বাপু হে, তোমরা তো মহাত্মা গান্ধীজীর চেলা, নন্-কো-অপারেশন করবে; বিলাতী মাল আমদানী বন্ধ করবে কি?" মাড়ওয়াড়ী উত্তরে মুখের কাছে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি ধরে দিল। সভা সমিতির উত্তেজনা প্রায়ই এই ধরণের ব্যাপার, কালীঘাটে শপথ করে স্বদেশী কাপড় পরার মত বিড়ম্বনা। যত লোক সেই পুরান স্বদেশীর দিনে মায়ের চরণ স্পর্শ করে শপথ করেছিল, তার অর্দ্ধেক যদি সে পণ রাখতো, তা' হ'লে দশটা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল চলতো। তবু উত্তেজনার কাজ আছে, পনর আনা ব্যর্থ হ'লেও এক আনা সার্থক। এই পথে ভাব আসে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কারা স্বরাজ নেবে? সে মানুষ কোথায়? যারা অন্তরে বাহিরে মুক্ত নয়, তারা দেশের মুক্তি আনবে কি করে? অর্থাৎ যা' আমরা চাচ্ছি, এটা কি বিলাতী স্বরাজ না ভারতের বা প্রাচ্যের কিছু? এমন মানুষ আছে, এমন জাতও আছে যাকে বাঁধা যায় না, কারণ সে কায়ে মনে জ্ঞানে মুক্ত। সে বোঝে না বাঁধন কি।

আমার কাছে গুটি কয়েক পাঞ্জাবী এসেছিল; তাঁরা নন্-কো অপারেশন বা সাহচর্য্য-বর্জ্জন সম্বন্ধে বল্লেন, 'দেখ, আমরা শিখরা কয়েকবার কাবুল জয় করি, কিন্তু সব কয়বারই ফিরে আসতে হয়, টিঁকতে পারি নাই। পাঠানদের দেশ জালিয়ে দাও, গ্রাম নগর অধিকার কর, তারা বনে পাহাড়ে গিয়ে পালিয়ে থাকবে, আর তোমাদের এক একটি করে মারবে। কারণ তারা বাঁধন বোঝে না। তাই বলছি দেশে ভাব অস্থিমজ্জাগত হয় নাই।" সে যুগে পাঠানদের সম্বন্ধে একথা সত্য ছিল, এখন সীমান্তের অনেক পাঠান জাতই ইংরাজের অধীন। কিন্তু পাঞ্জাবীর এই কথা কয়টিতে একটা প্রকাণ্ড সত্য নিহিত

আছে। কিন্তু যে মুক্তির কথা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বল্লেন, সে পশুর মুক্তি, বনের বাঘ ভাল্লুক, আন্দামানের বুনো "জাররাওয়ালা"ও ঐ রকম মুক্ত; তাই মানুষ নয় তাদের মেরে মেরে নির্ব্বংশ করে, নয় বনে বাদাড়ে তাড়িয়ে রাখে। সুন্দর-বনে বাঘ মুক্ত, পাহাড়ে পাঠান মুক্ত।

আর এক মুক্তি আছে যা' মনুষ্যত্বের মুক্তি, এই হিসাবে আইরিশ ও পোল (Poles) মুক্ত। পরাধীন অবস্থায়ও এই দুই দেশে বড় বড় মাথাওয়ালা মানুষ গজিয়েছে, আজও আইরিষ জেনারাল বিনা ইংরাজ বাহিনী চলে না। এরা একদিন মুক্ত হবেই, অথবা মুক্তির পথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই রকম মানুষের মুক্তিই এত দিন পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সভ্যতার শেষ কথা ছিল। আমার মুক্তি আর সুখ চাই, এই কলরবে এই গুঁতোগুঁতিতে জগতে ক্রমাগত নরহত্যা চলছে। যত মুক্তির তৃষ্ণা, তত রক্তের নদী। তা'তো হবেই, কারণ "আমার" বলে কোলের কাছে ঝোল টানতে আরম্ভ করলে ত আর রক্ষা নাই, স্বার্থের টানাটানিতে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি বড় একটা দেখা যায় না। ক্রোধ লোভ বলে প্রবৃত্তি গুলোকে নাই দিয়ে মাথায় চড়াবে, অথচ ন্যায় বুদ্ধি ও পরের জন্য দরদ - রাখবে—এ রকম মনের অবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক (individualistic) সভ্যতায় সম্ভব নয়।

তাই এবার পাশ্চাত্যের সভ্যতা থমকে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘ বা commune এসে ব্যক্তি বা individualকে মুছে দিচ্ছে। এটা একটা প্রতিক্রিয়া, অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন কুকুর, তার তেমনি মুগুর চাই; তাই এত দিনকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-বাদের শত্রু হয়েছে আজ সঙ্ঘ-বাদ। কিন্তু মানুষকে মুছে বা খর্ব্ব করে সমাজ বা রাষ্ট্র হয় না, আবার সমাজ বা রাষ্ট্রকে গৌণ করে মানুষ বড় হ'লে কাজ চলে না। দুইএর মিলন চাই, সামঞ্জস্য চাই, দুইএরই অবাধ দ্বন্দ্বহারা মুক্তি চাই। তা' কিসে হয়? এই সমস্যা আজ জগতের সামনে এসেছে বলেই আজ যুগসন্ধিক্ষণ। বুঝি বা সন্ধি কাল পেরিয়ে যুগান্তর আরম্ভ হয়ে গেছে।

এই নব-যুগ আনবার জন্যে মানুষের মধ্যে চাই দেবতার মুক্তি। তোমার অন্তর রাজ্যে কংশের কারাগারে দেবতা শৃঙ্খলিত আছে, তাকে ছেড়ে দাও, সে অভিনব মাধুর্য্যে ফুটুক। পশুর মাঝে মানুষ বন্ধ আছে, মানুষের মাঝে দেবতা বাঁধা আছে। মানুষকে মুক্তি দিলে পশুর থাক থেকে উঠে যাই, আর দেবতাকে রেহাই দিলে ঋষির পদবী পাই। এই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি, অন্তর মুক্ত হলে সে মানুষ স্বরাট হয়, তার স্বরাজ্য আপনিই গড়ে ওঠে। যে দেশে এত বড় আদর্শ

—এত বড় বন্ধনহীনতার বারতা এসে সকলের জীবন অল্পবিস্তর রঙে দিয়েছে, সে দেশকে বাঁধে কে? সে যে জগৎকে চালাবে বিশ্ব আলো করে নতুন সভ্যতার বাল রবি যে তারই উদয়াচলে উঠবে।

আমাদের ধারণা মানুষ এত বড় একটা জানোয়ার নয় যে তার চার হাত পায়ে শাস্ত্রের দড়িদড়া, গলায় আচার ধর্ম্মের শিকল,মুখে লোকলজ্জার ঠুলি, আর পিছনে চুরাশি নরকের উদ্যত ঠ্যাঙ্গা না থাকলে সে পশু সংসার-উদ্যান তছনছ করে দেয়। আমরা কিন্তু ভাবি তাই, আমরা পশু চিনি ; মানুষ চিনি না,মানুষের মহত্ত্ব গরিমা বুঝি না। তাই এ দেশে দড়ি বাঁধা পশু জন্মায় ; সমাজ ও শাস্ত্রের গণ্ডীটুকুর মাঝে নিরীহ একঘেঁয়ে ধর্ম্মভীরু জীবনযাপন করে, আহার নিদ্রা মৈথুন করে তারা চলে যায়। গরু, ভেড়া, ঘোড়া, হাতি এই সব পশুর জীবনে দেখবে সনাতন কাল থেকে তারা নিরুদ্বেগে ঐ রকম ঘাস খেয়ে পুরান জীবনের ক-য়ে দাগা বুলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কিন্তু মানুষ বলেই এত নিয়ম এত শাস্ত্রের শিকল ছিঁড়েও সে বদলায়, বুদ্ধ এসে যজ্ঞধুম নিবিয়ে দেয়, শঙ্কর এসে শূন্যবাদের ভণ্ডামী থেকে জগতকে বাঁচায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এসে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে। তাই বলি রাজনৈতিক বন্ধন ত আছেই, আমাদের সমাজের পাথর Social domination যে আরও ভয়ানক ; ধর্ম্মের বদ্ধ স্রোতহীন পানাপুকুর যে ততোধিক প্রাণঘাতী! গতি না থাকলে জীবন—কি ব্যক্তির, কি সমাজের, কি জাতির সকলের জীবন যে মৃত্যুমুখী হয়। গতিকে যে মানে না বা ভয় করে, সে যে সৃষ্টির দেবতাকে ভুলে গেছে।

এই সর্ব্বপাশমুক্তির কথা যে বলবে সেই আমাদের জীবন-পথের দিশারী, সেই আমাদের নেতা। আর আমরা পথের মানুষ নই, এখন আমরা লক্ষ্যের মানুষ, এইটে একবার মনে প্রাণে বুঝি। ওগো তোমার—"সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেও না ফিরে।" অবাধ অনন্ত দিকহারা মুক্তির মাঝে যে বড় হয়, সেই ত দেবতা! বেঁধে যাকে ভাল রাখতে হয়, সে তো মানুষ নয়, সে যে পশু। বন্ধনের লোভ, খাঁচার মোহ, ত্যাগ করা চাই ; বন্ধনকে সহজ সুখকর অনায়াস বাঁধিগৎ বলে ভালবাসি বলেই আমরা বদ্ধ, মুক্তির উধাও অনন্ত কুলহারা ব্যাপকতাকে ভয় করি বলেই আমরা বদ্ধ। এস ভাই, একবার দুর্ব্বার মুক্তিকে ভাল বাসতে শেখ, অনিশ্চিতের মহাযাত্রাকে বুকে ধরবার সাহস প্রাণে ধর, সৃষ্টির ঠাকুরকে বিশ্বাস কর —দেখবে,

"ভগবান আজ শুনেছেন তোর
কাতর প্রাণের সকল চাওয়া।"

মন্ত্র।

[শ্রীকণকভূষণ সেন গুপ্ত।]

তোমারি রূপে তোমারি রসে
তোমারি গন্ধ দিয়া,
পূর্ণ করহে পূর্ণ করহে
পূর্ণ কর এ হিয়া।
ওহে. সিন্ধু তীরের
স্বর্ণ পুরের
দিব্য মহাজন,
ওহে অন্ধ কারের
পর পারের
দীপ্য মহাধন!
চিত্ত আমার তোমার দ্বারে
স্তুতি করিছে গিয়া,
মুগ্ধ করহে মুক্ত করহে
কৌশলে পরশিয়া।

ভিখারী।

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

(১)

দৈনিক "সন্ধ্যার" স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"নগদ ১০০৲ টাকা পুরস্কার, ৪ বছরের একটি ছেলে হারাইয়া গিয়াছে, রং ফরসা চেহারা মোটা সোটা, জোড়া ভুরুর মাঝে একটি বড় তিল আছে, যে সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

তারা সুন্দরী দেব্যা।
৪৯নং বারীন্দ্র স্কোয়ার, ভবানীপুর।

(২)

রহিম রোজ "সন্ধ্যা" কাগজখানা পড়িত। বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ চোখে পড়িল। সে ভাবিল—"ছেলেটি যদি ফিরে দিই তা হ'লে নগদ ১০০৲ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে আর কদিন চল্‌বে—তাছাড়া শালারা পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে আমার ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিই, কত ১০০৲ টাকা আন্‌বে—এ ছেলেকে সেই অবস্থায় দেখলে লোকের দয়া হবেই।"

(৩)

রহিমের মা হীরা বেওয়ার রূপযৌবনে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গুণ্ডামি করিয়া রহিমের সংসার চলিত এবং নেশার খরচ আসিত। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে শুনিল তাহারই দলের এক বন্ধু তাহার মার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া গহনাপত্র টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছে—কেবল বন্ধুর মা বলিয়া খাতির করিয়া প্রাণে মারে নাই। গুণ্ডামির উপর রহিমের ঘৃণা হইয়া গেল। সে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু জেল-ফেরতের ভাল কাজ আর কোথায় হইবে? অবশেষে কসাইখানায় একটা কাজ পাইল। সেখানে থাকিতে থাকিতে হাতের আঙুলগুলি কুষ্ঠরোগে নুলো হইয়া যাওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িতে হইল।

(৪)

রহিম কোকেন খায়, মধ্যে মধ্যে তাহার পিয়ারীর বাড়ী এক একবার যায়—আর এক অভিনব ব্যবসা করে। এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরেই সে তারা সুন্দরীর ছেলেটিকে চুরি করে। একদিন পুরোদস্তর নেশা করিয়া আসিয়া সে ছেলেটিকে chloroform করিল—এবং তাহার হাঁটুর শির গুলি কাটিয়া ফেলিল এবং চোখ দুটি অন্ধ করিয়া দিল। কি জানি কি কারণে সে এই কাজটি সাদা চোখে করিতে পারিত না—তাই নেশায় বিভোর হইয়া আসিত। তাহার ব্যবসাই হইয়াছিল—ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া তাহাদিগকে অঙ্গহীন করা এবং রাস্তায় বসাইয়া তাহাদের পাওয়া ভিক্ষাতে খরচ চালানো। শিয়ালদহ, হাওড়া, হারিসন রোডের মোড়, ধর্ম্মতলা, কালীঘাট প্রভৃতি নানা স্থানে সে তাহার এই রোজগারের কলগুলি বসাইয়া রাখিয়া যাইত। তাহাদিগকে দু'বেলা বাসায় লইয়া গিয়া স্নেহ যত্নে খাওয়াইত—আবার রাখিয়া যাইত।

(৬)

রহিমের মা বলিত—"বাবা, কার জন্য এই পাপ করিস, ওকাজ আর করিস

নে, ভিক্ষে মেগে খাবো সেও ভাল। তুই তো বাবা, একটা বিয়েও করলিনে!" রহিম বলিত—"মা কুলীনের ঝাড় আর বাড়িয়ে কি হবে, আর এখন কে-ই বা বিয়ে দেবে, আর এই যে ছেলে-মেয়ে গুলো এদের ভারই বা কে নেবে। মরণ পর্য্যন্ত আমাকে এদের নিয়েই থাকতে হবে। আর মা, এতে পাপই বা কি? চটের কল তো দেখনি, সেখানে হাজার হাজার লোককে পিশে কল ওয়ালারা পয়সা করছে, গাড়োয়ান ঘোড়া গরু খাটিয়ে পয়সা করছে—আর মা তোমায় খেতে দেওয়ার জন্য আমি এদের না খাটিয়ে বসিয়ে রেখে দু'পয়সা রোজগার করছি—এতে খোদা আমার উপর চটবেন না। এতে যদি পাপ হয় তো দুনিয়াই পাপে ডুবে আছে!"

(৬)

তারা সুন্দরী একমাত্র পুত্র হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়াছিলেন। দুঃখিনী বিধবা পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার কামনায় রোজ কালীঘাটে মায়ের পায়ে ফুল চন্দন দিয়া আসিতেন। কতদিন কাটিয়া গেল—সন্তানের দর্শন আর মিলিল না। ভাবিলেন মরিয়া গিয়াছে—আর পাইব না। আর মাকে ফুল চন্দন দিয়া কি হইবে? কাল হইতে আর আসিব না। ভিখারীর জ্বালায় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন—তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে দিতে আর কখ্‌খনো মন্দিরে আসিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন—এমন সময় কোমল কণ্ঠে একটি বালকের চীৎকার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল—"মা, মা, আমায় কিছু দিয়ে যাও, আমার যে মা, নড়ে খাবার সাধ্যি নেই।"

(৭)

বারবার কাতর কণ্ঠে মা মা ডাক শুনিয়া তারাসুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন—মনে হইল যেন এ চেনা-সুর, অনেকদিন আগের শোনা। ভিক্ষা দিতে কাছে গিয়া মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—সংজ্ঞা হারাইবার পূর্ব্বেই "বাছারে আমার—" এই কথা কয়টি জননীর মুখ হইতে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। বালকের অন্ধ নয়ন গলিয়া মাতার মূর্চ্ছিত ম্লান মুখে পড়িয়া অশ্রুধারার প্রয়াগ রচনা করিল।

আগমনী

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

(গান)

আমার স্বপন তোরা শুনবি যদি
হেথায় বারেক আয় রে।
আমি একা পড়ে' কেউ কাছে নাই,
কারে বা শুনাই রে!
দেখলাম শীতল করে দিল ধরা
একটি মলয়-বায় রে,
তার পরশ পেয়ে পশু পাখী সব
নেচে নেচে যায় রে!
অমনি মৃত তরু মুঞ্জরিত
শাখা-প্রশাখায় রে,
তারা ফুল-বাসে সাজিয়ে তনু
কারে যেন চায় রে।
তাইতে হঠাৎ ভানু দিলেন দেখা
ঐ পূর্ব্বাশায় রে,
তার কিরণ মেখে মনের সুখে
সব নূতন গাথা গায় রে।
ওরে মাঝ খানেতে মায়ের মূর্ত্তি
কোটি ভানু বাইরে,
সেই কোটি ভানু মায়ের জ্যোতিঃ
চৌদিকে ছড়ায় রে।
আমার নিশার শেষে দেখা স্বপন
সত্যি হবে ভাই রে,
আমি সেই অবধি জেগেই আছি,
আঁখি মুদি নাই রে।

ওরে আয় ছুটে ভাই আয়রে সবাই,
মায়ের আগমনী গাই রে,
আয় মায়ের ছেলে আন্‌তে মায়ে
চল মায়ের ধামে যাই রে।

সুখের ঘর গড়া।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]।

তারামণির কাহিনী শুনিয়া অবধি যজ্ঞেশ্বরীর নারীহৃদয়টী তার দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল। আর তার পিসির মহত্ত্বের কথায় সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পাড়া গাঁয়ের দৈন্যের পঙ্কিল জলেও যে এমন হৃদয়-পদ্ম ফুটিতে পারে যজ্ঞেশ্বরীর সে বিশ্বাস ছিল না। নিজের হৃদয় দর্পণে পরের দুঃখের ছবি দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার বড় ইচ্ছা হইল এই বৃদ্ধাকে স্বচক্ষে দেখেন ও এই দীন দরিদ্র সংসারটীর সহিত একটী স্নেহের সম্বন্ধ পাতান। অঞ্চলে কিছু মিষ্টান্ন বাঁধিয়া, কিছু অর্থ লইয়া তিনি বড় মেয়ে কিরণ আর দেবর-ঝি নলিনীকে বলিলেন, "চল্ কিরণ চল না, নেউগী পুকুরে নেয়ে আসি গে"—নেউগী পুকুরের জলের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন ; সে তখন আষাঢ়ের মাঝামাঝি ; দিঘির ছায়া ঘোরালো, কালো কুচ্‌কুচে কাকচক্ষু জল কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে ; ধারে ধারে সাদা লাল কত শালুক ফুটিয়া নিশার আকাশে তারার মত বাহার দিয়াছে। চার পাড়ে ঘন নারিকেল গাছের কুঞ্জ ; বাতাসে তাদের চূড়া গোঁ গোঁ করিয়া দুলিতেছে। পূব ধার দিয়া জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়ক ; সড়কের উপর স্নানের বাঁধা ঘাট ; ঘাটের উপর থাম্‌ওলা ছাদ বারাণ্ডা। পুকুরের উত্তরেই গা ঘেঁসিয়া নেউগী পাড়া ; নেউগী পাড়া বেতনীরই উত্তরাংশ।

নেউগী পুকুরে স্নানসুখ এ বাড়ীর ভাগ্যে রোজ বড় ঘটে না। এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় স্নান করিতে আসা গৃহস্থ মেয়েদের ঘটেই না, যদি আবার নিজের পাড়ায় ডোবা পুকুর থাকে। নেউগী পুকুরের নাম শুনিয়া তরুরও মন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল, 'মা, আমি যাব, মা?"

য। তুই আজ নয়; কাল তোকে নিয়ে যাব; নলি পথ চেনে, ও আমার সঙ্গে যাগ্—

তরু। (বিমর্ষ হইয়া) না মা, আমিও যাব!

যজ্ঞেশ্বরী ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "কি বললি? আবার বলতো?" তরু মাকে চিনিত। যজ্ঞেশ্বরী বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও বাঙ্গলার ধাতের মা নয়। তাঁর ইচ্ছাই আইন। তরু মায়ের স্বর শুনিয়াই আবদার প্রত্যাহার করিল। আচ্ছা মা কাল যাব—বলিয়াই চম্পট্ দিল। সৌদামিনী দেখিল ও শিখিল। এই আবদার নলিনী তার কাছে করিলে সেদিন মায়ে ঝিয়ে একটা ছোট খাটো কুরুক্ষেত্র বাধাইত।

কিরণ ও নলিনী যজ্ঞেশ্বরীকে আগে করিয়া চলিল। পথে যজ্ঞেশ্বরী দেবর-কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নলিনী, তারামণিদের বাড়ী চিনিস্? ওই যে কে ব্রহ্ম ঠাকরুণ কোন্ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে?"

ন। হ্যাঁ চিনি জ্যাঠাই মা; কতদিন ওদের খিড়কির বাগানে শিউলিফুল কুড়ুতে গিইছি—

য। তারামণির মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে?

ন। একটু একটু হয়েছে, ভাল হয়নি; বড্ড লাজুক জ্যাঠাই মা—আমাদের বাড়ী আস্তে বলেছিনু, তা চুপ করে থাকে; বলে কখন যাব, রাঁধতে বাড়তে হয়।'

কিরণ। মেয়েটী কত বড় রে?

ন। আমাদের চেয়ে ছোট, বেশ দেখ্তে দিদিমণি, তোমার মত রং—তোমার চেয়েও ফর্শা। গয়না কিছু পরে না। হাতে দু'টো রাঙ্গা গালার চুড়ী, আর কিছু না জ্যাঠাই মা; ওর মা গয়না দেয়নি?

য। মা দিতে পারেনি বোধ হয়, ভগবান দিয়েছেন অনেক—ঠিক্ পথে যাচ্ছিস্ তো?

ন। বাঃ! আমি বুঝি জানিনি; ওই তো রথতলা, শিবু কামারের হাপরশাল আর একটু খানি গেলেই হবে—বাঁধা ঘাটে নাইবে তো?

য। আগে তারামণিদের বাড়ী যাব!

ন। সেই ঘাটের কাছেই তাদের ঘর।

কি। মেয়টীর নাম কিরে নলি?

ন। সন্ধ্যামণি! কি নাম তার ঠিক নেই। ওর মা ডাকে সন্নি বলে, ঠাকুরমা বলে 'মণি'।

কি। তুই বলিস্—মনমিছরি—তরুকে আন্লে হতো মা—

য। তোর কাকী একলা থাক্বে? কাল আসবে'খন।

কথা কহিতে কহিতে তিনজনে ব্রহ্ম ঠাকরুণের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের আগড় ঠেলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্ম ঠাকরুণ তখন শাগ্ বাছিতেছিলেন। সন্ধ্যামণি রান্নাঘর হইতে কিসের জন্য বাহিরে আসিয়াছিল। দুইজন অপরিচিতা ও পরিচিতা নলিনীকে দেখিয়া সন্ধ্যা কিছু বিস্মিত ও বিব্রত হইল। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া একমনে কাজ করাতে ব্রহ্ম ঠাকরুণ অভ্যাগতাদের দেখিতে পান নাই; বয়সধর্ম্মে চোখের ও কাছের দোষ হওয়াতেও ইহাদের আগমন সংবাদ তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পৌছায় নাই। কাণের দোষ আবার বিশেষ রকমের বেশী। নলিনী অগ্রসর হইয়া—"কি সন্ধি কি কর্ছিস্?"—বলিয়া নিজেদের আগমন সূচনা করিল। সন্ধি তবু নির্ব্বাক ও স্থিরদৃষ্টি। যজ্ঞেশ্বরী অগ্রগামিনী হইয়া ব্রহ্ম ঠাকরুণের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন—'পিশিমা, তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এলাম—ব্রহ্ম ঠাকরুণ শাগ হইতে চোখ তুলিয়া কান ফিরাইলেন - বলিলেন, "না বাছা, বেড়াতে আর কই গেলাম; গেলে কি চলে? যাবই বা কোথা বাছা?"

নতমুখী সন্ধ্যা যজ্ঞেশ্বরীকে বলিল—"আস্তে আস্তে কাণের কাছে বলুন, ঠাকুরমা ভাল শুন্তে পায় না"। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন পিসিমার কাণ শুধু শোনে না; অন্যায় করিয়া ভুল শোনে ও গোল বাধায়। তিনি কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমরা মা মুখুয্যে বাড়ী থেকে এসেছি; ভোলানাথ মুখুয্যে ও-পাড়ার; —তার বড় ভাজ আমি; তোমাদের পুকুরে নাইতে যাচ্ছিলাম, তা' ভাবলাম তারামণির পিসিমার পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।

বে। এস মা লোকনাথের স্ত্রী তুমি? লোকনাথ আর গোকুল যে খুব বন্ধু ছিল; বস মা, এসেছ দেশে তা শুনিছি, তা বাছা চোখ কাণ খেয়ে বসে আছি, যাব যে একবার দেখতে শুনতে তা পারিনি।

য। তুমি কেন কষ্ট করে যাবে, পিসি? আমরাই তো আসবো—

বে। তা' আসবেই তো, দীনদুঃখী বলে তো তোমাদের গরব চ্যাটাং নেই, লোকনাথ ভোলানাথ দু'ভাই-ই, সাক্ষাৎ ভোলানাথই বটে। কোথায় লোকনাথ আর কোথায় গোকুলনাথ! ভাই ভাজ গুষ্টিকে যমের মুখে তুলে দিয়ে এই দেখ মা ভূষণ্ডী কাগ্ হয়ে বসে আছি। যাবার নাম নেই! মণি কোথা লো, তোর জ্যাঠাইমাকে বসতে জায়গা দে—চোখ নেই যে দেখবো - তেমন করে। বুড়ীর

চোখে একটা চশমা সুতা দিয়ে মাথার পিছনে আটকানো ছিল। সেটাকে নাকের উপর ঠিক ভাবে ধরিয়া ব্রহ্ম ঠাকরুণ মুখ তুলিয়া কিরণ ও নলিনীকে দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—এটীতো ভুলুর মেয়ে—না? কি নাম মনেও নেই—

য। নবনলিনী—

ব্র। হ্যা, তাই বটে; ওটি কি তোমার মেয়ে?

য। হ্যাঁ মা, বড় মেয়ে কিরণ শশী।

ব্র। ও যে দুধের ছেলে বউ! এর মধ্যে এই দশা করে বসে আছে?—হায়রে! হায়রে! বস্ দিদি—কি দেখতে এলি মা? তৈরি হয়ে পোঁটলা নিয়ে বসেছিনু—নৌকো ছাড়বো, এমন সময় ভগবান বল্লে "এই নে বোঝা; আবার সংসারে ঢোক,—এর মধ্যে কোথা যাবি?" আবার মা পায়ে বেড়ী হাতে দড়ি; —গোকুলের মেয়ে তারামণি বিধবা হয়ে ছেলেপিলে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো! দিনান্তে মা আমারই জোটে না; কোথা থেকে এতগুলি পেট ভর্ত্তি করি? ওর ভাসুর দেওর ঠাই দিলে না, ভাই মুখপোড়া জগু ছোড়া—গোকুলের পেরথম পক্ষের ছেলে, সেও খোঁজ কল্লেনে—যায় কোথা ছুঁড়ী কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে? যার বোঝা সে বয়, মা! আমরা শুধু হাতের কল! তা মা বেশ করিছিস্ দেশে এসেছিস্- তোরা যদি থাক্‌বিনি আসবিনি, আসবে কি কত গুলো শ্যাল কুকুর চোর ছ্যাঁচড়।

য। তারা ঠাকুরঝি কোথা পিসিমা?

ব্র। আর কোথা? মনিব বাড়ী হাঁড়ি ঠেলতে গেছে! গোকুলের মেয়ের কপালে এও ছিল, আর আমায় বসে বসে তাই দেখতে হচ্ছে! বেলা তিন পহর গেলে, একবার আসবে মেয়েটাকে দেখতে, আবার সন্ধ্যার আগেই চলে যাবে। সোমত্ত মেয়েকে মা পেটের ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি করতে পাঠিয়েছি! গতর নিজের থাকলে তা কি করতে দিতুম, মা!

সন্ধ্যা তখন রান্না ঘরের কাজ হইতে একটু অবসর লইয়া নলিনীর সহিত আলাপ অছিলায় আগন্তুকদের দেখিতে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী সন্ধ্যাকে এক দৃষ্টে দেখিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিলেন। কী সে আদরের ডাক, অত ছোট ডাকটীতে তত স্নেহ তত প্রীতি যে থাকিতে পারে সে পূর্ব্বে তাহা অনুভব করে নাই। সে কাছে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী তাহার মাথাটীর ঘ্রাণ লইয়া আঙুল দিয়া রুক্ষ চুলের জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন:—"পিসিমা, তারাদিদির খাসা মেয়েটী, এত ছোট মেয়ে রাঁধতে পারে?"

ব্র। না পারলে চলবে কেন মা? আমাদের তিনটী প্রাণীর রান্না বৈত নয়। তরু তো ও-বাড়ীতে খায় না; এখানে সিঁদে নিয়ে আসে। ওই মেয়েই রাঁধে—

এমন সময় তারার চার পাঁচ বছরের মেয়ে ঊষামণি— ধুলা কাদা মাখা নধর দেহটী লইয়া কতক গুলা ছেঁড়া লতাপাতা লইয়া ঠাকুরমার কাছে উপস্থিত। সেও ঠাকুরমার দেখা দেখি দৈনিক শাকান্নের শাক সংগ্রহে বাহির হইয়াছিল। বেড়ার পাশ হইতে কতকগুলা ঘাস ও বুনো লতাপাতা লইয়া ঠাকুরমাকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়া, বাড়ীতে অপরিচিত লোকের আবির্ভাব দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। যজ্ঞেশ্বরীর ও কিরণের চিত্ত সেই অতি সুন্দর অথচ দুগ্ধাভাবে অপুষ্ট ক্ষীণ শিশুটীকে দেখিয়া বাৎসল্য রসে ভরিয়া উঠিল।

য। এটী বুঝি তারা দিদির কোলের মেয়ে?

ব্র। হ্যাঁ মা! ভগবানের শাস্তি! ভাগ্যের—

য। বলনি পিসিমা!

যজ্ঞেশ্বরী উঠিয়া গিয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ঊষামনি (মুকা) প্রথমটা অপরিচিতের সঙ্গে প্রথমদর্শনে 'পিরীতি' অবৈধ বুঝিয়া আপত্তি করিবার মন করে; কিন্তু যজ্ঞেশ্বরীর স্নেহস্পর্শের ভিতর দিয়া দু'টী অপরিচিত হৃদয়ের মধ্যে তৎক্ষণাৎ কি একটা অজানা বোঝা-পড়া হইয়া গেল, ঊষামনি এই গায়ে-পড়া আদর গায়ে মাখিয়া লইল। তারপর যখন যজ্ঞেশ্বরী অঞ্চল হইতে নারিকেল-নাড়ু করটী বাহির করিয়া তার গুটীদুই ঊষাকে ঘুষ দিলেন; তখন সদ্ভাব স্থাপনের পথে আর কোনো বাধাই রহিল না। Entente cordiale পুরাদমে ঘটিল। মিষ্টান্নের বাকী অংশটা সন্ধ্যামণির হাতে দিয়া যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন, "মা মনি তুমিও কিছু খাও"! মনি খাইল না, ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইল। কিরণ বলিল, 'খাও দিদি, লজ্জা কি?'

স। ননি এসে খাবে—

ননি সেই ভাইটী সন্ধ্যারই ছোট। জমীদার বাড়ীতে সে কাজ করে! যজ্ঞেশ্বরী এই ছোট্ট মেয়েটীর ভ্রাতৃস্নেহে ও বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিলেন। দারিদ্র্যের কাঁটা গাছের এইগুলি অমূল্য ফুল!

য। পিসি মা তারু দিদিকে দেখ্‌তে আর একদিন আসবো, খোকাও যেন সে দিন থাকে? কখন থাকে তারা—?

ব্র। (অন্যমনস্ক থাকায় শুনিতে না পাইয়া) হ্যাঁ খোকাও খাবে, বৈকি! ও তেমন নয়, বৌমা! তাকে না দিয়ে খাবে না—

য। তা' বল্‌ছিনি পিসিমা! খোকা বাড়ী আসে কখন? তারু ঠাকুরঝিই বা কখন আসবে?

ব্র। এই দুপুরের পর; দু' এক দণ্ড যা' থাকে এসে, তাও রোজ নয়?

য। পিসিমা আমার ছোট মা বল্‌ছিল তুমি খুব ভাল ব্রতকথা বল্‌তে পার, আমি মাঝে মাঝে এসে শুন্‌বো মনে কর্‌ছি, শোনাবে?

ব্র। কিসের কথা বল্লে? শুন্‌তে কি পাই সব কথা বাছা।

য। (মুখ কাণের কাছে লইয়া গিয়া) তোমার মুখে ব্রত কথা শুন্‌বো মনে কর্‌ছি।

ব্র। তা বেশ তো, এসনা; আর অপ্‌সর এখন তেমন আছে কি মা? ওপাড়ার হরি মিত্তির, কালী চৌধুরী, ওদের মেয়েরা আসে কথা শুন্‌তে তা এসনা মা—বসেই তো থাকি। উঠ্‌ছ নাকি?

য। যাই নাইতে, আবার রান্না বান্না আছে।

ব্র। এস মা!···তারু এলে একদিন যেতে বলবো; যাবেই বা কখন—

য। না তাকে যেতে হবে না; আমি এখন রোজ এই পুকুরে নাইতে আস্‌বো, এলে দেখা করে যাবো।

এই বলিয়া যজ্ঞেশ্বরী খুকীকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যামনির চিবুকে হাত দিয়া চুম খাইয়া তাকে আড়ালে লইয়া গিয়া হাতে টাকাটী দিয়া বলিলেন—'ভাই বোনে সন্দেশ খেয়ো'—। এই বলিয়া তাহারা অদৃশ্য হইলে সন্ধ্যা ঠাকুরমার কাছে আসিয়া বলিল,—

স। 'কে ওঁরা ঠাকুরমা?

ব্র। নলির জ্যাঠাই। ওপাড়ায় বাড়ী, লোকনাথের পরিবার; তোরা তো ওদের কখনো দেখিস্ নি, চিন্‌বি কি করে? আহা খাসা মানুষ; যেন অন্নপূর্ণা ভগবতী। কেমন লোকের বউ আর কেমন লোকের স্ত্রী!

স। বেশ ভালবাসে ঠাকুরমা! একটা টাকা দিয়ে গেল, বল্লে 'ভাইবোনে সন্দেশ খেয়ো'। বলিয়া টাকাটী ঠাকুরমার হাতে ছিল!

ব্র। বটে? তা বেশ দিদি! দেবতা না মানুষ? আহা বেঁচে থাক্ লোকনাথ এম্‌নি মানুষই ছেল, বৌও হয়েছে তেম্‌নি—তা যা এই শাগ্ গুলো নে যা—আমি মালায় বসি; খুকী কোথা? কোথাও বেরুস্‌নি দিদি—বাইরে ভোঁদড় এসেছে।

খুকী ভোঁদড় নামক অপরিচিত জীবটীকে না দেখিয়াই শুধু নাম শুনিয়াই ভয় করিতে শিখিয়াছিল। সে সম্মতি জানাইয়া—নারিকেল নাড়ুর প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

* * * *

ঘাটে আসিয়াই ঘাট দেখিয়া মায়ে ও মেয়েতে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গলার পল্লীসুন্দরীর ভাণ্ডারে অন্ন নাই থাক্, স্বাস্থ্য নাই থাক্ অঙ্গে এখনো সৌন্দর্য্য অঢেল! আজন্ম নগরবাসে অভ্যস্তা যজ্ঞেশ্বরী এবং কিরণশশী মুগ্ধ নয়নে পুকুরের সেই বীচিবিক্ষোভিত কালো জলে নারিকেল গাছের গতিশীল সাপের-মত কম্পমান ছায়ার খেলা; আর অফুরন্ত ফুটন্ত শালুক ফুলের মেলা দেখিতে লাগিলেন।

কি। কি জল মা! মরি মরি! দেখেই যেন গা হিম হয়ে যায়—

নলিনী গ্রাম্যবালিকা—শিশু বয়স হইতে তার পুকুরের জলের সঙ্গে পানার মত নিবিড় সম্বন্ধ। সে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আর মুহূর্ত্তে সাঁতরাইয়া দশবিশ হাত চলিয়া গেল। কিরণের কাছে তার সেই জলকেলী বড় সুন্দর লাগিল। কিন্তু তার ভয়ও হইল; সে আজন্ম নগরে লালিত পালিত, পুকুরের ছোট্ট সংস্করণ কলতলার চৌবাচ্ছার সঙ্গেই তার যা কিছু আর যত পরিচয়। অগাধ জলভরা এত বড় পুকুরে অবলীলায় সাঁতার দেওয়া মেয়ে ছেলের পক্ষে তার কাছে একটা দুঃসাহসের কাজ! সে ভয়ে ভয়ে সিড়ি ভাঙ্গিয়া এক কোমর মাত্র জলে গিয়া আর পা বাড়াইল না। নলিনী হাঁসের মত ভাসিতে ভাসিতে দুর হইতে চঞ্চল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—'দিদি শালুক নেবে?'

কি। নেবো, আন্‌তে পারবি?

ন। খুব খুব; কত চাও?

য। খাসা মেয়েটী তারামণির মা, কিরণ?

কি। ভারি চমৎকার! যেন ধূলাকাদা মাখা হীরের টুক্‌রো—আমাদের মত হলে ওকে বৌ করতে, মা?

য। না হলেও করতে রাজী আছি—

কি! আর খুকীটী?

য। একই পেটের তো—? কিন্তু সব চেয়ে মানুষ দেখুন ওদের ঠাকুরমা বুড়ী; বেহ্ম পিসি!—এমন মানুষও এখনো আছে—তারু ঠাকুর ঝি রাঁধুনীগিরি করছে? আমার স্বামীর বাল্য বন্ধুর মেয়ে! কি করে চোখে দেখবো—?

কি। না কল্লেই কি করবে, মা? উপায়ান্তর কি? ছেলেকটাকে মানুষ করতে হবে তো?

য। নলি, ও নলি—নোড়ামুখী—চলে আয়?

কি। (হাসিয়া) কি মুখী? মায়ের সব নতুন নতুন গাল।

য। পোড়ামুখী মেয়ে ছেলেকে বল্‌তে নেই! নে শিগ্‌গির সেরে নে—নলি ফিরে আয়—কলসীটা আন্‌লে হতো—খাসা জল!

কি! উঠ্‌তে ইচ্ছে করছে না—

য। সত্যি মা! জলে যে বলে শরীর শুদ্ধ করে তা ঠিক—শরীরের মনের পাপ যেন ধুয়ে যায়—তা সত্যি কথা শরীরটা প্রসন্ন হলে মনটাও তাই হয়!

ফিরিয়া আসিয়া নলিনী একবোঝা শালুক লইয়া গর্ব্বভরে দিদিকে অর্ঘ্য দিল। কিরণ ফুল দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

য। তোরা ওঠ্‌ আমি আহ্নিক সেরে নি—

দুই বোনে স্নান সারিয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠিল! ভিজা কাল চুল হইতে মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে দুই জনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আহ্নিকনিরতা যজ্ঞেশ্বরীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সরকারী বাঁধের রাহী লোকেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে সেই বাঁধাঘাটে আসিয়া জল খাইত, বিশ্রাম করিত; অনেক দূরান্তের রাহিলোকেরা পাড়ের বাগানে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইত; তাহাদের সুবিধার জন্য একটী ছোট মুদীর দোকান ঘাটের গায়েই করা হইয়াছিল। তাহাতে মুড়ী মুড়কী, মণ্ডা, বাতাসা, চিনি এই সবই থাকিত; হাঁড়ী, কাঠ, চাল ডাল, নুন তেলও যার যেমন দরকার পাইত। বাঁধ পার হইয়া ধানের ক্ষেত, কত যে বড় তার আর সীমা নাই, শেষ নাই। যেন একটা মাঠ সমুদ্র! দিগন্তে গিয়া ক্ষেতে আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু' একটা সঙ্গহীন তাল মাথা তুলিয়া যেন নির্জ্জনবাসের দণ্ড ভোগ করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে কিরণের চোখ এমন অবাধ দৃশ্য সম্ভোগ কখনো করে নাই! সে কৌতূহলী মনটাকে রাশছাড়া করিয়া দিয়াছে; দু'টী চোখের ঘাড়ে চাপিয়া মনটা আকাশে বাতাসে, মাঠের সবুজে ছুটাছুটী করিতেছে। নলিনীর এ সবে ভাবোদ্রেক হয় না, সে নিজের হাতের শালুকগুলার কোন্‌ কোন্‌টা তরুকে দিবে তাহারই মানস বন্দবস্ত করিতেছিল।

এমন সময়ে হঠাৎ কিরণের যোগভঙ্গ হইল, "সরে দাঁড়াও তো গা, একটু রাস্তা দাও তো বাছা—" বলিয়া দুটী রমণী কিরণের মনটাকে চোখ হইতে কানে

ফিরাইয়া আনিল। কিরণ ব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অগ্রগামিনী ওই কথা কয়টী বলিবার পর রাস্তা সাফ্‌ হইলে, পশ্চাৎগামিনী বলিলেন—'ছুঁসনে বাছা!' যার ছোঁয়াকে ভয় সে স্নানশুদ্ধা; যিনি ভয় করিতেছেন, তিনি অস্নাতা, সুতরাং অশুদ্ধা!! দু'বোনে যথাসম্ভব উহাদের শুচি বাচাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রমণীদ্বয় নীচে নামিয়া গেল। জলে পা ডুবাইয়া ধাপে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলঃ—

চাপা অস্ফুট প্রশ্নে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল—'এঁরা কে রে নলি?'

ন। ঐ পাড়ায় বাড়ী, একজন শুঁড়ীদের বৌ, আর একজন ভট্‌চার্জ্জি গিন্নি;—ঐ যে কাল মত মোটা, নাকে নৎ, গায়ে খুব গয়না, ও হলো জগন্নাথ শুঁড়ীর বৌ—আর ওই ফরসা মত, লম্বা ও হলো জীবন ভট্‌চাজ্জির পরিবার, জমিদার বাড়ীর পথে আসতে সেই যে বাগানটা দেখিয়ে বললে 'বেশ পঞ্চমুখী জবা ফুটে আছে' সে ওই শুঁড়ীদের বাগান।—

কি। (হাসিয়া) নাইতে এসেছে না বাসর জাগতে এসেছে?—বাবা, গয়নার ঘটা দেখ!

ন। ও তো কি দিদি! ওর মেয়ে, শ্যামকিশোরী, সে দিন ভগবান চাটুজ্যের বাড়ী খেতে গিছলো; তার শুধু চোখ দুটো আর মুখটা বাদ বাকী সব সোণামোড়া, তাকে ধরে বসাতে হয়, ধরে তুলতে হয়! আবার সঙ্গে একটা গিছলো বাক্স নিয়ে। এটা খুলছে, ওটা পরাচ্ছে; পহরে পহরে গয়না বদ্‌লানো হচ্ছে! সভায় বসবার একহার, এক চুড়ী, আবার খাবার সময় এক রকম।

কি। ঝাঁটা মার্‌! চল এগিয়ে গিয়ে শুনি কি কথা সব হচ্ছে—মা কখন আস্‌বেন?—

দু'ধাপ নামিয়া দুজনে গিয়া দাঁড়াইল। শুড়ী বৌ আর ভট্‌চাজ্‌ পত্নী গল্প করিতে করিতে অপাঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীকে দেখিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে উপরে দণ্ডায়মানা দুটি মেয়েকে দেখিতেছে। নলিনী ভটচাজ গিন্নির চেনা, তাকে ডাকিয়া পরিচয় জানিতে খুবই ইচ্ছা কিন্তু লজ্জায় পারিতেছে না।

ঠিক এমন সময় এক নীচ জাতীয়া বৃদ্ধা কোমরে একটা বোঝা লইয়া একটি বৌ ও একটি ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইজনেই মুসলমানের মেয়ে, বেশ ভূষায় বুঝা গেল। সরকারী সড়কের ইহারা রাহী; খুবই শ্রান্ত ক্লান্ত; ঘাটের জলে তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বৌটি একহাতে একটি বদনা ও অপর হাতে ছেলেকে লইয়া ঘাটে নামিল; বৃদ্ধা বোঝা নামাইয়া

উপরে বাঁধা মেঝেতে বসিয়া ময়লা মোটা কাপড়ের আঁচল দিয়া মুখ পুঁছিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

মুসলমান বৌটি ঘাটের জলে জপনিরতা হিন্দু-বিধবা ও স্নাননিরতা হিন্দু সধবাকে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া থামিয়া গেল ও কি করিবে ভাবিতে লাগিল। তাহার হাতে বদনা দেখিয়া শুঁড়ী-গিন্নি মৎ নাড়িয়া ও পুরুৎ-গিন্নি চোখ পাকাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—থাম্ ছুড়ী দেখছিস নি, আমরা নাইছি? আস্পদ্দা দেখ! এই ঘাটে এসেছে!—পাড় দিয়ে জল তুলতে কি হয়েছিল?" ধমক খাইয়া বৌ ব্যাচারী একেবারে এতটুকু! গর্জ্জন শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃশ্য দেখিয়া ব্যাপার বুঝিলেন। পিপাসা কাতর দুটি মানব প্রাণী—নারী ও শিশু—মুসলমানের ঘরে জন্মিবার অপরাধে তৃষ্ণার জল পানেও তার স্বাধীনতা নাই! হায়রে জাতি! হায়রে ধর্ম্ম! যজ্ঞেশ্বরী বৌটিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা এই দিক ঘেঁসে নাম এসে—এস এই দিকে?' বৌটি সেই স্নেহপূর্ণ সাদর আহ্বানে কতকটা আশ্বাস পাইল, কিন্তু পুরুৎ-গিন্নির ধমকের ভয়ে এক পা অগ্রসর হইবার ভরসা পাইল না। সে তর্জ্জনকারিণীদের দিকে একবার সভয় দৃষ্টিপাত করিল; উদ্দেশ্য জানা তারা কি বলে। তারা তো যজ্ঞেশ্বরীর দুঃসাহসে অবাক!

য। এই দিক দিয়ে এসে পাশ থেকে নাও না তুলে? আহা তেষ্টার জল!

পু-গি। ওমা সে কি গো? মুছলমান যে?

য। হলিই বা মা! কাগ্ বগের চেয়ে ভাল তো? তেষ্টার জল চায়, মানুষ তাতে বিঘ্ন ঘটালে পাপ হবে যে বাছা—

শুঁ-গি। তা বলে মুছুলমান—জল ছোঁবে? আমরা রইছি ঘাটে? বেশ কথা তো বাবু তোমার?

এই বলিয়া দু'জনে জল হইতে উঠিয়া ধাপের এক কোনে সরিয়া গিয়া জড় সড় হইয়া বসিল। মুখে বেজায় ব্যাজারের ভাব, চোখে বিরক্তির বিষ। বৌটী ছেলের হাত ধরিয়া অতি সন্তর্পণে জলের দিকে অগ্রসর হইল। ছেলেটীর হাতে [illegible] দিয়া বৌ তাকে জল তুলিতে ইসারা করিল। সে জলমগ্ন পিচ্ছিল ধাপে [illegible] ডুবাইতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দিলেন তার হাতের বদ্নাটা লইয়া নিজে কোমর জলে নামিয়া ভাল জল ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বৌটীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'নাও মা—'। বৌটী বদনা ও ছেলে লইয়া পরম কৃতজ্ঞতা ভরে যজ্ঞেশ্বরীর দিকে

তাকাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। নলিনী জ্যাঠাইমার দুঃসাহসিক অনাচার দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ জ্যাঠাই মা, ওরা যে মুছলমান গো"?

যজ্ঞেশ্বরী "জানি মা, বাড়ী গিয়ে গঙ্গাজল পরশ কল্লেই হবে", এই বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন 'বাড়ী চল্'। তিনজনে ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিল। পুরুৎ গিন্নি ও শুঁড়ী মহিষী তো হিন্দু বিধবার কাণ্ড দেখিয়া অবাক! যজ্ঞেশ্বরী ও কিরণ উপরে আসিয়া মুসলমান বুড়ীকে কি দু একটা প্রশ্ন করিলেন। নলিনী ম্লান শালুকগুলাকে আর একবার জলে চুবাইয়া লইতে লাগিলে পুরুৎ গৃহিণী চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যাঁলা ও তোর কে'?

ন। ওনি আমার জ্যাঠাই মা আর ও তাঁর মেয়ে—

নলিনী উঠিয়া গেলে, তিনজনে বাড়ী ফিরিলেন।

পুরুৎ গৃহিণী যজ্ঞেশ্বরীর এই দুঃসাহসিক ও ইচ্ছাকৃত নীরব অবজ্ঞায় একটা প্রচণ্ড ঘা খাইল। গ্রামের ছেলে বুড়া মাগী ছাগী যাহার শুচিবাইএ তটস্থ; জমীদার গোষ্ঠী যাহার যজবান, তাহাকে একজন অনাথা বিধবা মেয়ে এমনি করিয়া আমলে না আনিয়া অগ্রাহ্য করিয়া গেল, ইহার আঘাত শক্তিশেলের চেয়েও অসহ্য! তিনি বলিলেন—দেখলে, শুঁড়ীবৌ মাগীর আচরণটা! গরবে মাটীতে পা পড়ছে না যেন! হোক্ না সহুরে চাকুরের পরিবার গা! চাকরীর পয়সার এত গরব, ঝাঁটা মারি গরবের মুখে! গাঁয়ে এসেছেন এসেছেন সায়েবী ঢং দেখাতে;—

শুঁ-গি। জাত জম্মেও বিচার আচারের ধার ধারেনে—নাকি? বড় লোক তো আমরাও আছি গা!

পু-গি। বলে কিসের সঙ্গে কি! তবু যদি না ফলনা বেঁচে থাকৃতো —তারপর নিজের পুকুর হলে না জানি আরো কি করতো। অবাক্ কল্লে মা! আহ্নিক হচ্চিল না ঢং হচ্ছিলো!

শুঁ-গি। তাই আর একটা না হয় ডুব দে! ছ্যা! মা ছ্যা! আমরা তো জেতে ছোট তবু জাত ধর্ম্ম বোধ আছে, বিচের আচার করি—

পু-গি। তা' আর বল্তে বোন্, জাত হয় মনে; বংশে জন্মালেই কি হয়?

তৃতীয় ব্যক্তি কেহ সেখানে থাকিলে এই কথার সহিত কাজের অসঙ্গতিটা লক্ষ্য করিয়া খুব একটু হাসিত; আর সাহস থাকিলে সেটা বুঝাইয়া দিত।

তাহা হইল না। কাজেই দুজনে মিলিয়া বাকী সময়টা যজ্ঞেশ্বরী-চরিত্রের মিরন্ধুশ আলোচনা করিয়া স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিল।

পু-গি। ফল্‌না ভট্‌চার্জ্জির বাড়ীর অপমান করাটা কেমন তা দেখাচ্ছি! গ্যাদা বেরুবে! (ক্রমশঃ)

অন্তরে।

[শ্রীযামিনীরঞ্জন শিকদার]

কোথা নীরবতা কোথা কোলাহল ?
কোথায় অমৃত কোথা সে গরল ?
কোথা মরু কোথা ভূমি সে শ্যামল ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথায় আলোক কোথা অন্ধকার ?
কোথায় পুলক কোথা হাহাকার ?
কোথা শান্তি কোথা অমর দুর্ব্বার ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা সে বিজয় কোথা পরাজয় ?
কোথা সে সাহস কোথা সেই ভয় ?
কোথা সে স্বর্গ কোথা সে নিরয় ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা উত্তেজনা কোথা অবসাদ ?
কোথা চির সুখ কোথায় বিষাদ ?
কোথায় হুঙ্কার কোথা আর্ত্তনাদ ?
অন্তরে শুধু অন্তরে ?

কোথা সে অন্ধতা। কোথা সে নয়ন ?
কোথায় হর্ম্ম্য কোথা সে শ্মশান ?
কোথা সে উন্নতি কোথায় পতন ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথায় সুপ্তি কোথা জাগরণ ?
কোথায় মুক্তি কোথায় বাঁধন ?
কোথায় বিচ্ছেদ কোথায় মিলন ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা দুর্ব্বলতা কোথায় শকতি ?
কোথায় সে ঘৃণা কোথা সে ভকতি ?
কোথা আশীর্ব্বাদ কোথায় প্রণতি ?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা মোহ মায়া কোথা দিব্য জ্ঞান ?
কোথা সে হীনাত্মা কোথা মহাপ্রাণ ?
কোথা সে পিশাচ কোথা ভগবান ?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

পুরুষোত্তমের পত্র।

[শ্রীপুরুষোত্তম শর্ম্মা।]

সহকারী সম্পাদক ভায়া,

বলি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে কিছু মৌতাত ধরলে নাকি? তোমার এমন মতিভ্রম কেন? ভাদ্রের "নারায়ণ" পড়ে তোমার উপর মনটা এমনি চটে গেছল—ইচ্ছা হ'ল দিই ওই শ্রীমুখে খানিকটা কালী ছিটিয়ে, যাতে ও কালামুখ ভদ্রসমাজে আর না দেখাতে পার। কিন্তু দোয়াতে কলমের অর্দ্ধেকটা ডুবিয়ে কালী যখন

ছিটিয়ে দিয়েছি, তখন দেখি তুমি সেখানে নেই, আর কালীর ফোঁটা গুলো আমার মুখেই লেগেছে। সেই জন্যে রেগে তোমাকে এই কড়া চিঠিটা লিখে ফেললুম। এ মাসের "নারায়ণ" খানা নারী স্বাতন্ত্র্য, নারীজাতির প্রতি, স্বাধিকার সাধনা প্রভৃতি আজগুবি পাগলামীতে ভরিয়েছ। নেশার ঝোঁকে এই সনাতন নির্জীব শান্তির দেশে কোথাকার অশান্তি টেনে আন্‌ছ? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌ছি যে অবিলম্বে "নারায়ণের" বুকে নারী বিজয়গর্ব্বে বিরাজ করবেন। কিন্তু এ রকম কথাতো ছিল না। শ্মশানে ভাঙ্‌খোর শিবের বুকে শ্মশানেশ্বরী বিরাজ করুন, তা'তে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের হিন্দুর ঘরে নারায়ণের বুকে যে কোনদিন লক্ষ্মী বিরাজ করবেন একথা তো শাস্ত্রে লেখেনা। লক্ষ্মীতো চিরকাল নারায়ণের পদসেবা করবার জন্য সেবাদাসী মাত্র! কিন্তু তোমার এই পাগলামীর ফল শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে,মৌতাতের মোহাচ্ছন্ন চোখে তা' তুমি ঠিক দেখ্‌তে পার্চ্ছনা; সেই জন্য কলমের খোঁচা—অর্থাৎ কেরানী জীবনের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে তোমার দৃষ্টিটা একটু ফুটিয়ে দিতে চাই।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজশাস্ত্র যাঁ'রা গড়ে ছিলেন তাঁদের বিষয়ে আর যা'ই মত ভেদ থাক, তাঁ'রা যে পুরুষ মানুষ ছিলেন আর বেশ বিচক্ষণ পুরুষই ছিলেন, নারীদের বিষয়ে তাঁ'রা যে সকল পরিপাটী বিধি ব্যবস্থা ক'রে গেছেন সে গুলো দেখলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। তাঁরা এত মাথা ঘামিয়ে আমাদের জন্য যে সুবিধা গুলো ক'রে গেছেন, বুদ্ধির দোষে সে সব কেন খোয়াবে? না বুঝে শুঝে তুমি যে সব বিষয়ে চোখ বুঁজে বুঁজে ঘাড় নাড়ছ, সে সব ব্যাপার যদি বাস্তবিক ঘটে তাহ'লে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হ'বে, সেই কথা বলি শোন।

প্রথমেই, "পতি পরম গুরু"—যে কথাটা শুনলে আমাদের এই মুমূর্ষু প্রাণেও একবার আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায়—এ কথাটার মূল্য বিশেষ কমে যাবে। বলি তুমি তো আমাদের জাতেরই, ঘরের কথা জানতে তো আর কিছু বাকা নেই। পরম গুরুর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ স্থানেই যে গুরুত্ব কিছুই পাওয়া যায় না একথা জান তো! কিন্তু মেয়েরা ঐ মন্ত্রটা আউড়ে আউড়ে এমনি মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়েছে যে শতরূপে হীন ও কলুষিত চরিত্রের মধ্যেও তা'রা চোখ বুঁজে গুরুকে দেখবেই। কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে ভাবতে শেখালেই তা'রা বুদ্ধির দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে আমাদের ওজন করতে থাকবে। আর তার ফলে—বুঝছ তো—বিশ্বের সমক্ষে পরম গুরু একেবারে পরম লঘু হ'য়ে দাঁড়াবে। তার পর

এক ঘোর বিপদ—সে Testimonialএর অর্থাৎ সুপারিস চিঠির বিপদ। বাঙ্গালীর দাসত্বময় জীবন Testimonialএর বিপদ যে কি ভীষণ তা' বোঝ তো? যেখানেই যাও,—সুপারিস চিঠি Testimonial চাই। বিদ্যার, বুদ্ধির, চরিত্রের, টাকার,—আর এসব যদি কিছুই না থাকে অন্ততঃ Fair complexionএর বা কটা চামড়ার—Testimonial চাই। কিন্তু ঐ একটা জায়গা আছে—ছাঁদ্‌নাতলা—যেখানে বাঙ্গালীর ছেলেদের কোনোরকম Testimonial এখনও দরকার হয় না; অথচ সেখানে মস্ত বড় একটা দাঁও বেওয়ারিশ হ'য়ে পড়ে আছে। একটু সাহস ক'রে এগিয়ে যেতে পারলেই, অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা লাভ। কিন্তু তখন অর্দ্ধেক রাজত্বের আশা তো ত্যাগ করতেই হবে, তার ওপর রাজকন্যার কাছে যে রকম পরীক্ষা দিতে এবং Testimonial দাখিল করতে হ'বে সে সব কথা ভেবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য আমার চোখে জল আস্‌ছে। তারপর মিথ্যা আস্ফালন করবার ও ধমকাবার লোক তখন আর পাওয়া যাবে না। কোনো সাহেবের হাতে মার খেয়ে এসে, 'আজ এক শা—সাহেবকে আচ্ছা দু'ঘা দিয়েছি', হাত পা নেড়ে একটু ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে এসে দেশের উন্নতির ব্যবস্থা করে এলুম ইত্যাদি রকম মস্থণ মিথ্যাকথাগুলি ব'লে এখন আমরা আমাদের গৃহিণীদের মনে যে গৌরবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করি, সেটা চিরদিনের জন্য একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ তখন তা'রা সব দেখবে, জান্‌বে ও বুঝবে। আবার এখন চারিদিক থেকে অপমানিত হ'য়ে এসে আমরা সেই রুদ্ধ অপমানের ঝাল কারণে অকারণে গিন্নিদের ওপরই ঝেড়ে থাকি। কিন্তু তখন তাঁদের ধমকাব কি? তাঁদের কাছ থেকেই তিরস্কার খাবার ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকতে হবে! এখনও যে তাঁদের কাছে ধমক খাই না, আমিতো অন্ততঃ এত বড় মিথ্যা কথাটা বলতে পারব না। কিন্তু এখন যে সব বিষয়ে তাঁদের তিরস্কার লাভ করি, দেখেছি সে সব বিষয়ে তাঁদের উপদেশ শুনলে সাংসারিক উন্নতি বেশ অবাধে হ'তে থাকে। আমার অসাবধানতায় কেমন করে ভ্রাতৃবধূর বৎসরে একখান করে গহনা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা কি রকম অন্যায় ভাবে বেশী খাচ্ছেন, এ সমস্ত বিষয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে চোখ ফোটাতে তাঁদের মতন ওস্তাদ্ তো আর দেখি না। তখন গঞ্জনা তো খাবই কিন্তু সে গঞ্জনা মেনে চললে সাংসারিক উন্নতি হওয়া চুলোয় যাক—সাংসারিক দুর্দ্দশা পদে পদে হবে। কারণ তখন তাঁরা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকবেন না। আমি বেশ দেখেছি একটু বেশী বিদ্যা বুদ্ধি

হ'লেই মানুষ কি রকম যেন ক্ষেপে যায়! তখন মাথা ঠাণ্ডা করে সে আর ঠিক নীতিকথা বলতে পারে না। তারপর আর এক বিষম বালাই বাড়বে। সব জায়গাতেই আমাদের এখন ক্রটি হলেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কেবল ঐখানে এ বালাই একেবারেই নেই; বরং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরাই তাঁদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎটা শুদ শুদ্ধ আদায় করে থাকি। এখন খাদ্যাখাদ্য যা ইচ্ছা খাচ্ছি, গম্যাগম্য সকল স্থানেই যাচ্চি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যা ইচ্ছা করছি, কোন জবাবদিহির দরকার হয় না। কিন্তু তখন প্রত্যেক অন্যায়কাজের জবাবদিহি করতে করতে আমাদের একেবারে কেষ্টোর নামে জবাব দিতে হবে। এখন "ভাগ্যবানের বৌ মরে" এই মহাবাক্যের সত্যরক্ষার জন্যে আমরা মুখে বিধবাদের কল্যাণার্থ একাদশীতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যা করতে করতে কুমারীদের উদ্ধারার্থে ক্রমান্বয়ে বিবাহের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি প্রয়োজন হলে চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত বাহির করে থাকি। অনেক জায়গায় পুরাতন সংস্করণ নিঃশেষ হবার আগেই নূতন সংস্করণ বাহির করে থাকি। কিন্তু তখন প্রথম সংস্করণ বাহির করাটাই একটা মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। ক্রমেই পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, আর একটা কথা বলেই পাততাড়ি গুটুব। বলি ভায়া হে, বাঙ্গালীর তো সবই গেছে, আমার বলতে আর আছে কি? ওই একমাত্র আঁচলে-গেরো গিন্নীটা আছেন, যাকে এই মৃত্যু-অন্ধকারে হাৎড়ে গললগ্ন করে বাঙ্গালী গলা ছেড়ে বলতে পারে—"ওগো এটী আমার।" সেই একমাত্র নিছক আপনার জনকে পর করে দেবার জন্যে তোমার এত চেষ্টা কেন? আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি বঙ্গ-সংসারের উপর কালাপাহাড় মূর্ত্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টায় আছ। তোমাদের এই রকম উপদ্রব বেশী দিন চালালেই ঘর বাহির সব এক হয়ে যাবে। আমাদের এত কষ্টে আর খরচায় তৈরী, কত যত্নে ও বুদ্ধি করে চারিদিক আঁটা সনাতন ঘরগুলো সব ভেঙ্গে মাঠ হ'য়ে যাবে, আর সেই খোলা মাঠে বাঙ্গলার নরনারীতে মিলে ম্লেচ্ছকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। ভায়া, এখনও সময় আছে দুর্ম্মতি সংযত কর। ভাল ছেলের মত জপ কর আর ওঁদের দিয়েও জপাও "নারী নরকের দ্বার, পুরুষস্বর্গের দ্বার"—"পতি পরমগুরু—পতি পরমগুরু"।

পুঃ—দাদা, এতে অনেক ঘরের কথা লিখে ফেলেছি—দেখো যেন ভুলে ছাপিয়ে দিও না। তা' হ'লে ওঁদের কাছে মুখ দেখানো ভার হবে।

প্রেম-মূলে।

(শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী)

যদি, তুলসীর মালা বক্ষে ধরিলে
দরশ মিলিত তা'র
তাহা হ'লে গলে দোলাতেম যে গো
তুলি তুলসীর ঝাড়;
পাথর পূজিলে মহেশের পদ
মিলিত যদি গো, তবে
পাহাড় পূজিতে জগতে বল না
কুণ্ঠিত কেবা হ'বে?
ভজনে পূজনে মেলেনা গো তারে
ফেরে সে যে প্রেম চেয়ে
শুধু প্রেম-মূলে যমুনারি কূলে
কিনেছে আহীর মেয়ে।

বাঙ্গালী কি আর্য্য?

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত]

কথাটা অনেক দিন হইল শুনিতেছি। পুরাতন দল "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য" এই কথাটাই ধরিয়া খাতেরজমা হইয়া বসিয়া আছেন আর যে কেউ আমাদের অনার্য্য বলিতে যান তাঁহাদিগকে গালিগালাজ করিতেছেন। আর নূতনের দল সমান ক্ষেপিয়াছেন আমাদের অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় অনেক দিনের পর কথাটা আবার তুলিয়াছেন।

এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার প্রথম মনে হয় এ কথা লইয়া এত মাতামতি বাড়াবাড়ি কেন? আর্য্যই হই অনার্য্যই হই, আমরা যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই যখন থাকিব, তখন একথা লইয়া এত চেঁচামেচি কেন। অনার্য্য হইলেই ব্যাবিলনী, কি ইজিপ্টীয়, কি ঈজিয় কি হিট্টাইণ্টদিগের মত গৌরব হয় না, আধুনিক জাপানী বা প্রাচনী

চীনের সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসা যায় না। আর আর্য্য হইলেই এমন কিছু কুলীন হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে আর্য্য সভ্যতার যে গৌরব ছিল, এই সব অনার্য্য জাতিদের গৌরব তা'র চেয়ে কোনও অংশে হীন বলা যায় না। বর্ত্তমান কালেও অনার্য্য জাপান গৌরবে কোনও তথাকথিত আর্য্যজাতি হইতে হীন নহে। পক্ষান্তরে আর্য্য বংশীয় বর্ব্বর প্রাচীন জর্ম্মাণ বা স্কান্দিনেবিয়ান জাতি যে খুব একটা উন্নত জাতি ছিল তাও বলা যায় না। তবে এ কথায় আমাদের বর্ত্তমান বা অতীতের গৌরবের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আমরা ছোট না বড় সেটা নির্ণয় হইবে আমরা বাঙ্গালী হিসাবে কতটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি তাই দিয়া। আমাদের প্রাচীন গৌরব কি ছিল সেও প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তিকলাপ দিয়া। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়াছিল, না আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল, না এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর গৌরবের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

এই কথাটা মনে রাখিয়া কেবল অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভাবে এ কথার ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা সত্যে উপনীত হইতে পারিব।

হেমন্ত বাবু বলিয়াছেন আমরা অন্—আর্য্য! মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় রক্ত আমাদের শরীরে প্রবল। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যরক্তের যে মিশ্রণ আছে তাও অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? আমরা একটা মিশ্র জাতি এটা খাঁটি সত্য। সেজন্য আমাদিগকে অন-আর্য্য বলিতে হয় বল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর্য্যজাতি কোথায় আছে? গ্রীসের আর্য্যের যে কতটা বেশী পরিমাণে ইজিয় (Aegian) জাতির সঙ্গে ভেজাল ছিল, সেটা আজকাল খুব বেশী পরিমাণে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া রোম, জর্ম্মাণী স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া প্রভৃতি যত আদিমকালের আর্য্য-নিবাস ছিল, সে সব কোনও স্থানেই খাঁটি আর্য্যজাতি ছিল না। আজও কোথাও আর্য্যজাতি নাই। নৃতত্ত্ববিদের শাস্ত্রে 'আর্য্য' কথাটা আর মনুষ্য জাতির শ্রেণী বিভাগে শুনা যায় না। আর্য্যবাদ এখন "Aryan heresy" বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং আমরা আর্য্য নই এ কথা যেমন সত্য, এ জগতে কোথাও আর্য্য জাতি নাই, সে কথাটাও তেমনি সত্য। এই আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কত প্রাচীন কালে এই আর্য্যজাতির রক্তের ভিতর ভেজাল আরম্ভ হইয়াছিল। বেদের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে নানা মুনির

নানা মত। তাহা ছাড়া বেদ যে কোথায় রচিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে সব চেয়ে প্রাচীন দু'টি আর্য্যজাতির কথা আমরা পাই, একটি মিটানী রাজ্যে আর একটি ব্যাবিলনের ক্যাসাইট বংশে। সে প্রায় চার হাজার বছরের কথা। তখন দেখিতে পাই মিটানীর রাজা দশরট্ট (দশরথ?) তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন ইজিপ্ট রাজের সঙ্গে। ক্যাসাইট রাজা কাদাশমান—এনলিল ইজিপ্টের রাজা তৃতীয় আমেন হেটেপকে কন্যা দান করিবার জন্য কড়া তলব পাঠাইয়াছিলেন।* রাজায় রাজায় যখন এমনি হইত তখন ছোটখাট লোকের মধ্যে "দুষ্কুলাদপি" স্ত্রীসংগ্রহণ হইত না কে বলিবে। পক্ষান্তরে শূদ্র ও অনার্য্যের ভিতর হইতে যে স্ত্রীসংগ্রহণ হইত এবং তাহাদের পুত্রেরা পুত্ররূপে পরিগণিত হইত ইহার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদের কড়াকড়ি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে হইয়াছিল। সকল দেশেই আর্য্যজাতি এমনি করিয়া আর্য্যেতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

যদিও নিঃসংশয়ে এ কথা এখনো বলা যায় না, তবু মনে হয় আর্য্যজাতি এক সময়ে ভূতপূর্ব্ব অপসিরিয়াল ও হিটাইট সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে যে স্থানে আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সেই স্থানে পূর্ব্বে নানাজাতির বল ছিল, ব্যাবিলনের সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় সভ্যতা সজীব ছিল। আর্য্য-জাতি ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে হউক পরে হউক এই সমুদয় জাতির সহিত অনেকটা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, একথা সত্য হইলে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও যে খাঁটি আর্য্য ছিলেন এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। অথর্ব্বাঙ্গিরসের ভিতর যে সব আচার অনুষ্ঠান পাই, ঋগ্‌বেদেও যে সমুদয় আচার অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাই, তার ভিতর অনেকটা যে এই সব অন-আর্য্য জাতি হইতে গৃহীত নয় তাহা কে বলিবে?

আর্য্য জাতির বিবাহ বিধান হইতে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য এবং আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানান্তরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রাহ্ম বিবাহই আদিম আর্য্য বিবাহ পদ্ধতি†।

* Hall; History of the Middle East p. 257-61.

† প্রতিভা ১৩২৫—'প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান'।

আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিধি অনার্য্য জাতিগণের বিবাহ বিধান হইতে ধার করা। আসুর বিবাহে কন্যা মূল্য দিয়া ক্রয় করা হয়। আসুর জাতির (Assyrian) মধ্যে কেবল এই উপায়েই বিবাহ হইত, তাহা আমরা জানিতে পারি। রাক্ষস বিধান অদ্যাপি ভারতের বহু স্থানে অসভ্য জাতি-দিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহা ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের নিকট ধার করা এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দ্রাবিড় দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রাক্ষস নামক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ আছে পাণিনীও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহও ঐরূপ গান্ধারবাসী গন্ধর্ব্ব জাতি হইতে গৃহীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি আরও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, এই সমস্ত বিজাতীয় হীন বিবাহগুলিকে আর্য্য সংস্কার দ্বারা শোধিত করিবার চেষ্টায়ই দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। আসুরাদি বিবাহ দ্বারা কেবল মাত্র লৌকিক উপায়ে নারীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আর্য্য বিবাহের প্রধান ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর অদৃষ্ট সম্বন্ধ। সেই অদৃষ্ট সম্বন্ধ সূচিত করে শাস্ত্রীয় সংস্কার। সুতরাং নিকৃষ্ট বিবাহগুলিকে সংস্কার শোধিত করিয়া বিশেষভাবে আর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া লইয়া যে বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি হয় তাহারই নাম দৈব আর্য্য ও প্রাজাপত্য। পরবর্ত্তী কালে, ইহাতেও যখন কুলাইল না তখন আসুরাদি বিবাহকেও সংস্কারযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। বসিষ্টের মতে আসুরাদি বিবাহে সংস্কার না হইলে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। এই উপায়ে অনার্য্য অনুষ্ঠান সংস্কৃত করিয়া আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া গ্রহণ করা হইত।

সুতরাং আর্য্যজাতি যে 'অন-আর্য্য'জাতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট ভাবে গোড়া হইতেই মিশিয়া গিয়াছিল এবং "অন-আর্য্য" জাতির নিকট আচার অনুষ্ঠান অনেক ধার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলেই বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর অনার্য্যত্ব প্রমাণ হইল না। শরীর হিসাবে মানুষ একটা উচ্চ অঙ্গের পশু, কিন্তু অন্তরের হিসাবে সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। এই অন্তরটাই হইল মানুষের বেশীর ভাগ। পশু হিসাবে মানুষের বিভাগ এবং তার মনের হিসাবে বিভাগ সব সময় মিলে না। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকের কুলজী দেখিলে শেষে গিয়া ঠেকিতে হইবে একটা ফরাসীর নামে। জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্টের পূর্ব্বপুরুষ একজন স্কটলণ্ডবাসী।

তাই বলিয়া, কাণ্টকে স্কচ এবং মার্টিনোকে ফরাসী বলিয়া বর্ণনা করিলে যে ভুল হইবে সে বিষয় কি সন্দেহ আছে ? মানুষের মন দেখিয়া তার Culture-এর হিসাবে যে জাতিবিভাগ সেটা পশুবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র।

নৃতত্ত্ববিদ্ আর্য্যজাতি বলিয়া বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না ; কিন্তু আর্য্যভাষা ও আর্য্য Culture এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। আমরা আর্য্য কি অনার্য্য, আমাদের পশুত্ব হিসাবে এ কথার কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদের Cultureএর দিক হইতে এ প্রশ্নের একটা সার্থক উত্তর দেওয়া যায়। বাঙ্গালীর মন, তাহাদের Culture আর্য্য কি না এই কথাটাই অনুশীলনের যোগ্য। নাক চোখের মাপ দিয়া বাঙ্গালীর আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না।

বাঙ্গালীর শরীর মঙ্গোল হউক বা দ্রাবিড় হউক বা কোল হউক, তার মন জ্ঞান ও আচার আর্য্য কিনা এইটাই জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। কোনও জাতির Culture সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে প্রধানতঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীগুলির আচার, বিজ্ঞান, ভাষা ও ধর্ম্ম। নিম্নস্তরের মন দিয়া সমস্ত সমাজের Culture বিচার করা যায় না। নিম্নস্তরের যে জাতীয় জীবনের উপর কোনও প্রভাব নাই এ কথা বলি না ; কিন্তু সে প্রভাব গৌণ। প্রধানতঃ নিম্নস্তরই উচ্চস্তরের নিকট তাহাদের Culture প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে যে কোনও জাতির আর্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আমাদের একথা প্রমাণ করিতে হইবে না যে তাদের মন তাদের আচার অনুষ্ঠান, তাদের ভাষা সমস্তই ঠিক তিন চার হাজার বছরের পূর্ব্বেকার আর্য্যজাতির সঙ্গে আগা গোড়া মিলিয়া যায় ; কালবশে প্রভেদ হইবেই। তা ছাড়া আর্য্য সভ্যতা তাহার অনার্য্য আবেষ্টন হইতে যে অনেক জিনিষ আপনার ভিতর টানিয়া লইবে তাহাও নিশ্চয়। এই ধার করা মাল যদি আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য জীবনের আদর্শের সহিত সমীকৃত হইয়া থাকে, ফল কথা, এই ইতিহাসের মূল প্রাণের প্রবাহটা যদি আর্য্যের প্রাণ হয় তবেই আর্য্যত্ব বজায় থাকে। ডিমটি ফুটিয়া যেমন পাখীটি হয়, সমাজের ক্রমবিকাশ কখনই সে রকম হয় না। সমাজ বাড়িতে হইলে পরিণত জীব-শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে তাহার সমস্ত বাহ্যিক আবেষ্টন হইতে। সুতরাং আর্য্য জাতির চিন্তা ভাব ও আদর্শের স্রোত পদে পদে চতুর্দ্দিক হইতে আর্য্যেতর জাতির ভাব চিন্তা ও

আদর্শ লইয়া পুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ছাগল ঘাস খাইয়া শরীর পুষ্টি করে বলিয়া যেমন ছাগল ঘাস হইয়া যায় না, আমরা পাঁঠা খাইয়া শরীর পোষণ করিয়া প্রাঁটা হইয়া যাই না, তেমনি আর্য্য সভ্যতা ও culture অনার্য্য আচার অনুষ্ঠান লইয়া নিজের পুষ্টি করিয়াছে বলিয়া সে অনার্য্য হইয়া যায় না। আসল প্রশ্ন এই যে প্রাণের ধারার মূল প্রবাহটা আর্য্য না অনার্য্য।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙ্গালীর চিত্তজগৎ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই সেই কথাটা বিচার্য্য। চিত্তজগতের নানা প্রকাশের দিক হইতে একথা বিচার করা যাইতে পারে। একটা দিক আমাদের ভাষা। ভাষা-তত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের ভাষাটা তামিল তেলেগুর সামিল। সংস্কতের সামিল নয়। আমি ভাষাতত্ত্ববিৎ নহি, কিন্তু একথাটা অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিব না। কারণ সুনীতি বাবুও একথা অস্বীকার করেন না, যে, বাঙ্গলা ও প্রাকৃত প্রধানতঃ সংস্কতের বিকৃতি, সংস্কৃত ভাষা ভিন্নজাতির মুখে যাইয়া যেমন বিকৃত হইতে পারে তেমনি বিকৃতি। এইটুকুই আমার প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। একথা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গলা ভাষা আর্য্যবংশীয়।

আমাদের চিত্ত-জগতের আর একটা প্রকাণ্ড অংশ আমাদের সামাজিক জীবনে পাই। আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী এবং দৃঢ় বন্ধন আমাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ, ধর্ম্ম ও ব্যবহার। এই দিকটা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। বাঙ্গালী হিন্দুর উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জীবনের প্রত্যেক বড় ও ছোট ব্যাপার যে স্মৃতির বিধান দ্বারা নিয়মিত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে স্মৃতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া বেদের আমল হইতে রঘুনন্দন বা শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত একটা না একটা জীবন্ত ধারার সন্ধান পাই। তার প্রাণশক্তি ও কেন্দ্র আর্য্যের প্রাণ। আর্য্য ঋষিগণ যে আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, আমাদের আজিকার নিত্যকৃত্য এবং অষ্টাদশ সংস্কার প্রভৃতি সকলই সেই আচারাদি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন না হইলেও তাহারই পরিণতি মাত্র। দৈনিক জীবনে চিন্তার ভাবে জীবনের ছোট বড় সকল আদর্শে আমরা সেই আর্য্যের প্রাণে অনুপ্রাণিত। এই সকল আচার অনুষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে স্থানে স্থানে ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,

কোথাও বা বাহির হইতে কোনও নিয়ম বা অনুষ্ঠান ইহার ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে সমীকৃত হইয়া, আর্য্যসভ্যতার তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এদিক হইতে দেখিলেও দেখিতে পাই যে আমরা দ্রাবিড় হই বা মঙ্গোলীয় হই, আমাদের Culture, আমাদের সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতা। বুদ্ধদেবকে যখন শুদ্ধোদন পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, যে, আমি তোমার পুত্র নহি, আমি পূর্ব্ববুদ্ধদিগের বংশধর। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলকে আমাদের এমনি উত্তরই দিতে হইবে।

বাঙ্গালীর চিত্তজগতের, চাইকি সমস্ত ভারতবাসীরই চিত্তজগতের; এমন কতকগুলি প্রকাশ আছে যাহার মূল আমরা প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। তাই বলিয়া এগুলিও যে ভারতীয় আর্য্য সমাজ বলিতে যে প্রাচীন মিশ্র সমাজ বুঝি, তাহার ভিতর ছিল না একথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে যে সমসাময়িক সকল সামাজিক তথ্য ধৃত আছে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে। সে সময়েও সমাজের তলায় তলায় এমন সব তথ্য ছিল, যাহা কোন শাস্ত্র খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের মেয়েলী শাস্ত্র ধরা যাইতে পারে। এই যে আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারভূয়িষ্ঠ শাস্ত্র ইহার বেশীর ভাগের কোনও কথা বেদে পুরাণে নাই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ইহা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত স্ত্রী-শূদ্রের লৌকিক ধর্ম্মে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন গ্রন্থে যাহা লেখা হইল তাহা ছাড়া অন্যান্য তথ্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট শিখিতে হইবে। ইহা কি এই মেয়েলী শাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত নয়? হরদত্ত এ ইঙ্গিতে বুঝিয়াছেন অর্থশাস্ত্র। কিন্তু তাহা হইলে বিশেষভাবে স্ত্রালোকদের প্রতি উদ্দেশ কেন? তা' ছাড়া, আমরা জেন্দ আবেস্তা হইতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন পারশিকদের মধ্যে আমাদের চলিত মেয়েলীশাস্ত্রের অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই মেয়েলীশাস্ত্রও যে প্রাচীন কালের ধারা-প্রসূত এবং ইহার মধ্যে বাহিরের যে জিনিষ তাহাও যে প্রাচীন ধারার সহিত সমীকৃত একথা বলা যাইতে পারে।

তারপর, আমাদের দেশে অবস্থাগতিকে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সব ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায়ের যে আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ধারার সহিত কোনও সংযোগ ছিল না একথা কেহ বলিতে পারি না।

তাহার কতকগুলির মূল হয় তো আমাদের লৌকিক সংস্কারের, চাই কি প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কারের, উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেগুলি যখন আর্য্যধর্ম্মের সহিত সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল তখন তাহার বলে বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যেতর জাতি হইতে প্রাপ্ত একথা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না।

সুতরাং আমাদের চিত্তজগৎ হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়। পশুহিসাবে আমরা কোন দলে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমরা খাঁটি আর্য্য নই তাহা নিশ্চয়। কেবল তাহাই নয়, খাঁটি আর্য বলিয়া কোনও জাতি জগতে নাই এবং আর্য্যত্বের মূলে মানবজাতির কোনও শ্রেণী বিভাগ করা চলে না। কাজেই আমরা আর্য্য কি না, এ কথার উত্তর কেবল Cultureএর দিক হইতেই দেওয়া চলে। সে হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়।

জাপানী পুরাণ।

[শ্রীশরৎচন্দ্র পাল]

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে জাপান দেশীয় মত এই যে মনুষ্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতে বহুসংখ্যক দেববংশ ছিলেন। এই দেববংশের সর্ব্বশেষ বংশধর কেবলমাত্র আইজানাগী নামক এক ভ্রাতা ও আইজানামি নাম্নী এক ভগ্নী অবশিষ্ট ছিলেন। পরে এই ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ হইতে জাপান ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বহুসংখ্যক দেবদেবীর উৎপত্তি হয়। এই দেবগণের মধ্যে এক জনের জন্ম সময়ে আইজানামি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁহার স্বামী আইজানাগী পরলোকের দ্বারে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। আইজানামিও তাঁহার স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেইস্থানের দেবদেবীগণের পরামর্শ ও অনুমতি লইবার জন্য প্রবেশ করিলেন। আইজানামির ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার স্বামী আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজের মাথার চিরুণীর একটী দাড়া

ভাঙ্গিয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া সেই অন্ধকারময় পরলোকের দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে উহার স্ত্রী এক ভয়ানক শবদেহে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন; এবং তাহার মধ্য ভাগে ৮ জন বজ্রদেবত! অবস্থিত রহিয়াছেন। সেইজন্য জাপানীদিগের ৮ এই সংখ্যাটী, আমাদের দেশের ৩ সংখ্যা ও ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ সংখ্যার ন্যায় গূঢ়ার্থ ও কুলক্ষণসূচক।

আইজানাগি বিফলমনোরথ হইয়া জাপান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নদীজলে অবগাহন করিয়া নিজদেহ শুদ্ধ করিয়া লইলেন। এই সময় তাঁহার নিজদেহ হইতে ৩জন দেবতায় উৎপত্তি হইল। এই তিনজন দেবতার মধ্যে প্রথম তাঁহার বাম চক্ষু হইতে সূর্য্যের পরিচালিকা-স্বরূপ আমাতেরাসু দেবী, পরে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে চন্দ্র এবং শেষে তাঁহার নাসিকা হইতে প্রচণ্ড এবং মহাশক্তিমান পুরুষ সুধানুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। এই তিন সন্তানের মধ্যে তাঁহাদের পিতা এই জগৎ সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন।

জাপানদেশীয় প্রাচীন ও পৌরাণিক মত এই যে সূর্য্য আমাতেরাসু নাম্নী দেবী কর্ত্তৃক পরিচালিত হন। জাপানী ভাষায় আমাতেরায়ু অর্থে সর্ব্বপ্রভা বা স্বর্গের প্রভাকর এবং ইহা হইতেই জাপান রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্র নিজ উদ্ধত প্রকৃতি ও প্রবল পরাক্রান্ত ভ্রাতা সুধানুদেবের অনুগত। জাপানে জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে একটী শশক আছে এবং উহা পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বদা একটী হামান চন্দ্রমণ্ডলেদিস্তায় চাল গুড়া করিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে এই শশকের কল্পনাটী চীনদেশ হইতে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু পষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য চাল গুঁড়া করিতেছে এই ধারণাটী জাপান-বাসীর নিজস্ব কল্পনা শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে সূর্য্যমণ্ডলে একটী ত্রিপদ বিশিষ্ট বায়স বাস করিয়া থাকে। (জাপান দেশীয় মতে চন্দ্রস্ত্রীলোক)।

এই ত গেল জাপানের পুরাবৃত্ত।—এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, কারণ এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান না থাকিলে বর্ত্তমান কালে জাপানদেশেযে নানাবিধ সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সকলেই বোধ হয় জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম, শিন্তোধর্ম্ম, কনফিউ-সিয়ন ধর্ম্ম এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্মই প্রধান। ইহাদের

মধ্যে প্রথম ৪টী, তাও, শিন্তো, বৌদ্ধ ও কনফিউসন ধর্ম্ম জাপান জাতির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মটী প্রথম ভারতবর্ষ হইতে চীন, চীন হইতে কোরিয়া ও পরে কোরিয়া বাসীর নিকট হইতে জাপানবাসীরা গ্রহণ করেন। জাপানের ইতিহাসে কথিত আছে যে ৫৫২ খৃঃ অব্দে হাকুসাই নামক একজন কোরিয়ান রাজা মিকাডো-কিন-মেইকে বুদ্ধদেবের একটী সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকের কতকগুলি কাগজ-পত্র উপহার দেন। মিকাডো এই নবধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক থাকিলেও তাঁহার পুরাতন শিন্তোধর্ম্মাবলম্বী (Conservative Shintoists) মন্ত্রিদল, তাঁহাকে রাজসভা হইতে এই প্রতিমূর্ত্তি অপসারিত করিতে অনুরোধ করেন। মিকাডো অগত্যা এই মূর্ত্তিটী সোগানোইনামে নামক কোনও এক ভক্তকে উপহার দেন। তিনিই তাঁহার গ্রাম্য আবাসটীকে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করেন।

শিন্তোধর্ম্ম।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহা একটী বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ ইহার কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপুস্তক কিম্বা নীতিসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থও দেখা যায় না। জাপানে শিন্তোধর্ম্মের উন্নতির সময়কে তিনটী পৃথক যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মোটামুটী বলিতে গেলে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রথম যুগ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। এই সময়ের প্রচলিত সাধারণ সামাজিক নিয়মাদির মধ্যে 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোনও সতন্ত্র বিধি ব্যবস্থা ছিল না। তখন রাজবংশীয় পূর্ব্বপুরুষদের ও অন্যান্য মৃত মাহাত্মাদের পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইত। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জাপানীরা ক্রমশঃ জীবিত রাজাকেও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। চেম্বারলেন সাহেব আরও বলেন যে শিন্তোধর্ম্মের উত্থানের প্রথম যুগে এই ধর্ম্মটী কেবলমাত্র একটী রাজনৈতিক, তথা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি বিশেষ ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সময় হইতে শিন্তোধর্ম্মের দ্বিতীয় যুগ গণনা করা যায়। সেই সময় শিন্তোধর্ম্ম নবপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। চেম্বারলেন সাহেব আরও বলেন যে এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মনো-বিজ্ঞান অতিশয় প্রগাঢ় ভাবাপন্ন, ইহার ক্রিয়া-পদ্ধতি অতিশয় বিচিত্র ও ইহার

নীতিশাস্ত্র সবিশেষ উন্নত ছিল। এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণভিত্তিসম্পন্ন শিন্তোধর্ম্ম উন্নত বৌদ্ধধর্ম্মের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষমহইল। ৫০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিন্তোধর্ম্মের অন্ধকারময় দ্বিতীয়-যুগ। শিন্তোধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ও এই নব-প্রভাবান্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাও ধর্ম্মের নিকট দাঁড়াইতে পারিল না। তাহাদের পুরোহিত সকল ভবিষ্যৎকথন এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদে "একইসে ও ইজুমের" ন্যায় ২।৩টী বিখ্যাত ও প্রধান মন্দিরে শিন্তোধর্ম্মকে সরল ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যাইত। কিন্তু তাহাও অধিকদিন সেভাবে থাকিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব শিন্তোধর্ম্মের মধ্যে এত গভীরভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছিল যে শিন্তোধর্ম্মের নিজস্ব পার্থক্য-বোধক লক্ষণসমূহ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মে লীন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাদের সংমিশ্রণে "রিওবুশিন্তো" নামক অন্য এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। শিন্তোধর্ম্মের তৃতীয়যুগ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি গণনা করা হয়। ইহাকেই বিশুদ্ধ শিন্তোধর্ম্মের পুনর্জীবন লাভের সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক পরিচালিত শান্তিময় রাজত্বকালে জাপানের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের দেশের অতীত কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলির অনুসন্ধান, প্রাচীন ইতিহাস ও কবিতাসকলের পুনর্মুদ্রণ এবং প্রাচীন দেশভাষার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় হইতেই ধর্ম্মান্দোলনটী একটী রাজনৈতিক এবং স্বদেশানুরাগসূচক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও কনফিউসনধর্ম্ম বিদেশীয় বলিয়া অনাদৃত হইতে থাকে। এই সময়ের প্রসিদ্ধ শিন্তো পণ্ডিত সকল যথা মাবুচি (খৃঃ ১৬৯৭—১৭৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত) মতুরি (খৃঃ ১৭৩০—১৮০১ খৃঃ পর্য্যন্ত) এবং হিরাতা (খৃঃ ১৭৭৬—১৮৪৩ পর্য্যন্ত) ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে শিন্তোধর্ম্মকে একমাত্র রাজকীয় ধর্ম্মের পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। এই সময় শত শত মন্দির যাহা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম বা রিওবুশিন্তোধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল সেগুলি শোধিত করা হইয়াছিল (Purified) অর্থাৎ বৌদ্ধবিভূষণ বর্জ্জিত করিয়া ঐ মন্দিরগুলির রক্ষার ভার শিন্তোসম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু শিন্তোধর্ম্মের ভিত্তি সেরূপ সুদৃঢ় না থাকায় এবং তাহার অন্তঃসারবিহীন ধর্ম্মোপদেশ জনসাধারণের মনে সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষম

হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় জয়লাভ করিল। শিন্তোধর্ম্ম অদ্যাবধি রাজধর্ম্ম বলিয়া পুজিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী ছায়ার ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

কন্‌ফুসিয়সের ধর্ম্ম।

খৃষ্টযুগের প্রারম্ভে যখন চীনদেশের সভ্যতা ও তাহার সহিত অন্যান্য বিষয় জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময়ে কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্ম জাপানে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আইইয়াসু নামক একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, যিনি নিজে বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতিপোষক ছিলেন; তিনি কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল সর্ব্বপ্রথম জাপানী ভাষায় মুদ্রিত করেন। ইহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২৫০ বৎসরের মধ্যে দেশের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই কন্‌ফিউসন্ আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্মের ব্যবস্থাসকল প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইলেও উহার নীতিশাস্ত্রের উক্তিগুলি এখনও পর্য্যন্ত জাপানের সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। এমন কি প্রচলিত দেশ ভাষার মধ্যেও ইহার প্রভাব অল্প বিস্তর দেখা গিয়া থাকে।

তাও ধর্ম্ম।

তাও ধর্ম্ম কি কিম্বা ইহা বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা সুকঠিন। এমন কি জাইন সাহেব ও তাঁহার China and Chinese নামক সুবিখ্যাত সর্ব্বজন-আদৃত পুস্তকে বলিয়াছেন যে তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াও ইহার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এরূপ অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন কালের কোনও অজ্ঞাত সময়ে চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি উত্তরকালে লাওসুনামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জীবিতাবস্থায় অন্যান্য উপদেশের সহিত জন সাধারণকে এই একটী উপদেশ বিশেষ-ভাবে শিক্ষা দেন যে কেহ অসদ্ব্যবহার করিলে তাহার পরিবর্ত্তে সুব্যবহার করিতে হইবে। এক্ষণে তাঁহার জন্ম, বংশ এবং জীবনচরিত সমন্ধীয় কথা সকল কালক্রমে সঞ্চিত শতশত বর্ষের জনশ্রুতিতে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। এরূপ কথিত আছে যে তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে একটী জাতীয় প্লাবনের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার লিখিত 'তাওতেচিঙ্' নামক একখানি গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া

পাশ্চাত্যদেশে অন্তর্হিত হন। কিন্তু এই পুস্তকখানি যে তাঁহার দ্বারা রচিত তাহা বিশেষ কারণ বশতঃ স্বীকার করা যায় না। এস্থলে 'তাও' এই কথাটীর অর্থ প্রধানত "উপায়" বা "উন্নতি" বুঝায়; সেই জন্য লাওসুন লিখিত গ্রন্থের মুলতত্ত্বটিকে "উন্নতির পথ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দেব দেবী।

এক্ষণে বৌদ্ধ, শিন্তো ও কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্মের দেবদেবীর বিষয় যৎসামান্য-মাত্র কিছু উল্লেখ করিব, কারণ ইহাদের দেবদেবী অসংখ্য। এই তিনটী মহৎ ধর্ম্ম হইতে যে সকল দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে সেই সকল দেবদেবীকে অদ্যা-বধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে আমি কেবল মাত্র কুকুজিন অর্থাৎ ৭টী সৌভাগ্য দেবতা ও তাহাদের পরিচায়ক লক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

কুকুরোকুজো এবং জুরোজিন ইহারা উভয়েই অস্বাভাবিক বৃহদাকার মস্তিকের জন্য প্রসিদ্ধ। উভয়ের পার্শ্বদেশে একটী করিয়া জ্ঞান ও দীর্ঘায়ুর চিহ্ন স্বরূপ হরিণ ও সারস পক্ষী অবস্থিত। ধনদেবতা 'দাইকোকু' ইহাঁদের পার্শ্বদেশে এবং সম্মুখে অবস্থিত। চাউলের বস্তা সকল ধনদেবতার পরিচায়ক। 'এবেসু' হস্তে একটী মৎস্য ধারণ করিয়া আছেন। ইনি সততার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতিপোষক স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন। 'হোতেই'—প্রকাণ্ড অনাবৃত উদর, পৃষ্ঠে একটী থলি এবং হস্তে একটী পাখা ধারণ করিয়া আছেন। এই চিহ্নগুলি তৃপ্তি ও ভ্রাতৃত্বসূচক।

বিসামন—যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। একহস্তে একটী বর্ষা ও অপর হস্তে একটী ক্ষুদ্র মন্দির লইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি যুদ্ধের দেবতা।

বেনতেন—যুবক যুবতীরা ইহার পূজা অতি আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন। সমবেত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ইনি একমাত্র দেবী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা এবং ইনি রতিদেবী নামে পরিচিতা। ইহা ছাড়া রান্নাঘর, পাইখানা, শুইবার ঘর, গৃহ প্রবেশের পথ, পাতকো হাঁড়ি কলসী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান আছেন।

পুরোহিত বর্গ।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় শিন্তোধর্ম্মে পুরোহিত সম্প্রদায় আছেন। প্রত্যেক পুরোহিত এক এক দেবতার তত্ত্বধানে থাকেন। চেম্বারলেন সাহেব বলেন

মিকাডো তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যের পরিচালিকা আমতেরাষু দেবীর নিকট হইতে যে আর্শি তরবারি ও মণিমাণিক্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেগুলি ইহাদের সর্ব্বপুরাতন মন্দিরে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার এক কন্যা সদাসর্ব্বদা ঐ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু কোন্ মিকাডোর রাজত্বকালে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল চেম্বারলেন সাহেব বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই।

সমাজের কথা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

একাত্মতার উপর নূতন সমাজকে দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে, ধরিতে হইবে আপন আপন আত্মাকে। আত্মা কথাটি শুনিয়া কেহ ভড়কাইবেন না, ইহা খুব রহস্যময় প্রহেলিকা কিছু নয়; যাঁহারা ইহাকে ঐরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিব, কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিব না। মানুষের আছে প্রাণের দায়, মানুষের আছে মনের তাড়া, সেই রকমই মানুষের আছে আত্মার প্রেরণা অর্থাৎ তাহার নিগূঢ় স্বভাবের গতি। নিজের এই সবচেয়ে ভিতরকার সত্তা ও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া তবে কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রত্যেকে যদি আপন আত্মার প্রেরণায় পূর্ণ ও মুক্ত ভাবে আপনাকে চলিতে দেয়, করিতে থাকে যদি 'স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম', তবে আর সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ, সংঘর্ষের সম্ভাবনা হয় তখন যখন এক জনের দেখাদেখি সকলে মিলিয়া একই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় সব্যাজে ঢুকিয়া পড়ি ও ছুটিয়া চলি; ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয় তখন যখন জিনিষের উপর আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ও লোভ যাইয়া পড়ে কিন্তু ভুলিয়া যাই যখন ভিতরের স্বভাবের টান। তাহা না করিয়া, যদি আগে ভিতরটার সাথে বুঝাপড়া করি, যদি অন্তরাত্মার দাবী অনুসারে চলি তবে দেখিব কত

বিচিত্র রাস্তা আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে, আমাদের সমবেত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে, প্রত্যেকের চারিদিকে হাঁফ ছাড়িয়া চলিবার যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছে। পথের, কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যূনতা যে আমরা অনুভব করি, বাস্তবিক পক্ষে তাহা পথের বা কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকৃত অভাব ততখানি নয় যতখানি তাহা আমাদের অসহিষ্ণুতা, সম্মুখে যাহা কিছু পাই তাহা লইয়া ধরিয়া পড়িবার যে ব্যস্ততা তারই ফল।

তার পর অন্তরাত্মার ধর্ম্মই হইতেছে মিলন, ঐক্য। মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ দেহের প্রাণের ও মনের ক্ষেত্রে—যতক্ষণ থাকি এই-কয়টির মধ্যে ইহাদেরই দাবী দাওয়াকে চরম করিয়া তুলি, ইহাদেরই টানে নিজেকে হারাইয়া ফেলি, ভাসাইয়া দেই ততক্ষণ একরোখা স্বাতন্ত্র্য হয় আমাদের লক্ষ্য, ছল ও বল হয় আমাদের উপায়। কিন্তু ইহাদের উপরে যদি উঠিয়া যাই, যদি দেখি অনুভব করি ইহাদেরও ভিতরে পিছনে আছে আমার প্রকৃত সত্তা আমার প্রকৃত স্বভাব তখন সেই সঙ্গেই দেখিব অনুভব করিব যে আমা-ছাড়া অপরেরও আছে তাহার দেহের প্রাণের মনের অধীর দাবী দাওয়ার উপরে ভিতরে বা পশ্চাতে আমারই মত একটা নিভৃত সত্তা ও স্বভাব। আর এই দুই সত্তা ও দুই স্বভাব দাঁড়াইয়া আছে এমন একটি স্তরে যেখানে তাহাদের মিল অব্যর্থ, কারণ সেখানে তাহারা একই জিনিষের দুইটি দিক বা প্রকাশের ভঙ্গী। সেই স্তরে সর্ব্বদা সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রহিলে, আমাদের পরস্পরের নীচের দন্দ্বের স্তরগুলিও ক্রমে ক্রমে পায় একটা নিবিড় অটুট সামঞ্জস্য। প্রত্যেকে যখন আমরা এই অন্তরাত্মায় ভর করিয়া থাকি, ও সেই অনুসারে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের টানে আপন আপন পথ ও ক্ষেত্র করিয়া চলি তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈচিত্র লইয়া হইয়া উঠে সমষ্টির বা সঙ্ঘের পৃথক অথচ সম্মিলিত অঙ্গ চেষ্টা (organic function)।

প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে, কোথায় এই অন্তরাত্মা, কোথায় এই নিগূঢ় নিবিড় মিলনধর্ম্ম, বাস্তবে তাহার ত চিহ্ন কিছু দেখিতে পাই না, ইহা যে কল্পনা আকাশ কুসুম নয় তাই বা কে বলিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা চাই নিজের ভিতরে, আপন আপন মণি কোটায়। ভাল করিয়া স্থিতধী হইয়া দেখিলে প্রত্যেকেই কি নিজের নিজের মধ্যে এই রকম একটা মুক্তির ঐক্যের সামঞ্জস্যের ভাব অনুভব করে না? বাহিরের চাপ হইতে, দেহের তাড়া

প্রাণের দায়, মনের সংস্কার হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইলে কখন কোন মুহূর্ত্তে মানুষ কি এই রকম একটা উদার দিব্যসত্তার সন্ধান পায় না? প্রত্যেকেই পায়, তবে বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকেই মনে করে এ জিনিষটি নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল, ব্যস্তবসত্য যাহা তাহার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এ সন্দেহ কেন হয় না, যে তাহা সত্যও হইতে পারে? এই নিভৃত সত্যকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিবার কোন অবকাশই যে আমরা দিই না। উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ—সেই রকম এই অন্তরাত্মার সত্যও প্রত্যেকের মধ্যে উঠে, উঠিয়া আবার বুদ্‌বুদের মত বিলীন হইয়া যায়; পাগল নির্ব্বোধ আখ্যা পাইব বলিয়া আমরা কাহারও কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি না, তাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে বুঝা পড়া করিতে চাই না, নিজের নিজের মধ্যে তাহাকে আটকাইয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলি। দুই এক জন কবি ঋষির মুখ দিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে, আমাদের প্রাণের তন্ত্রী একটা তখনই বাজিয়া উঠে কিন্তু যত সত্বর পারি সুবোধ হইতে চেষ্টা করি, কবিকে ঋষিকে বাহবা দিয়া সরিয়া পড়ি।

ফলতঃ বাস্তবে যে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায় নাই তাহার কারণ আমাদের এই নিষ্ঠার অভাব। প্রথমতঃ আমরা ইহাকে ভাল করিয়া দেখিতে বুঝিতে চাই নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন প্রয়াস করি নাই। সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছি নীচের প্রকৃতি স্বভাবতঃ যে রকম ভাবে তাহাকে গড়িয়া লইয়াছে সেই ভাবেই। আমাদের ভিতরের অনুভবকে, উচ্চতর প্রেরণাকে বলি দিয়া বাহিরের নিম্নতর তাড়নাকেই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু বলা যাইতে পারে সমাজ যখন এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, এই ভাবেই চলিতেছে, তখন সমাজের এইটিই সনাতন নিয়ম; অন্তরাত্মার ধর্ম্মে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার নিষ্ঠাও আমাদের নাই চেষ্টাও নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে সমাজ-সত্তার মধ্যে এমন একটি অঙ্গীভূত বস্তু আছে যাহা ঐ জিনিষটিকে চাহে না, চাহিতে পারে না। কোন না কোন রকম সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত—দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ না থাকিলে সমাজও থাকে না।

কিন্তু ইহা শুধু আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের কথা। সমাজ একভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে আর একভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, এ কথা প্রাণ আমাদের বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও ইতিহাস যে ইহার সাক্ষ্য বা ন্যায়-শাস্ত্র ইহার প্রমাণ দিবে এমন বোধ হয় না। মানুষ তাহার অভ্যাস ও সংস্কারকে

যতই দৃঢ় অব্যভিচারী সনাতন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ—বলিয়া ধরিয়া লউক না কেন, কোন অভ্যাস কোন সংস্কারই তেমন নয়। অভ্যাসের সংস্কারেরও পরিবর্ত্তন হয়,—ব্যক্তিরও হয়, গোষ্ঠীরও হয়! আমি এমন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি চৌদ্দপুরুষ শুধু চৌদ্দ কেন, সমস্ত পুরুষ বোধ হয়, যাহার ছিল নিরামিষাষী আর নিজেও অর্দ্ধেক জীবন ভরিয়া ছিলেন তাই কিন্তু এখন হইয়াছেন পরম আমিষ-ভক্ত। জাতির পক্ষেও, ফরাসী জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি পরম রাজভক্ত—ফরাসী কেন, পৃথিবীতে এক সময়ে মানুষ মাত্রই বোধ হয় রাজা ছাড়া রাজ্যের কল্পনা করিতে পারিত না, অরাজকতা অর্থ ঘোর বিশৃঙ্খলতা এনার্কিজ্‌ম্—কিন্তু এখন সেই ফরাসীজাতির রাজভক্তি কোথায়, আর মানুষেরও সেই রাজার অভাব অর্থ অরাজকতা এ ধারণা কোথায়? কিন্তু বলা যাইতে পারে এ সব সংস্কার বা অভ্যাস মানুষের খুব গভীর স্তরের জিনিষ নয়, ইহারা ভাসা ভাসা উপরের উপরের, তাই ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব। ইহারা যে সনাতন নয়, তাহা আগে হইতেই ধরা যায়; কারণ, কোন না কোন দেশে, কোন না কোন কালে মানবজাতির মধ্যে ইহাদের ব্যভিচার অবশ্যই দেখা যায়। অভ্যাস অর্থাৎ habit or custom এক জিনিস, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ instinct আর এক জিনিষ। প্রথমটির পরিবর্ত্তন হয়, হইতেছে; কিন্তু দ্বিতীয়টির পরিবর্ত্তন কখন হয় না। আমিষপ্রিয়তা, রাজভক্তি, আভিজাত্য-পূজা অথবা আমাদের নানা নৈতিক আদর্শ সবই বিশেষ বিশেষ দেশকালের অভ্যাস ও রীতি; কিন্তু অহমিকা, স্বার্থবোধ, ব্যক্তিগত বিজিগীষা অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল ব্যাপী সনাতন ধর্ম্ম। কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ সমাজে দেখিয়াছি ইহাদের পরিবর্ত্তে মিলন সামঞ্জস্য একাত্মতা আধ্যাত্মিকতা স্থান পাইয়াছে, নূতন ব্যবস্থা আনিয়া দিয়াছে? এ কথার উত্তর এই, প্রথমতঃ, অভ্যাস আর সহজাত বৃত্তির মধ্যে একটা কাটাছাঁটা পার্থক্যরেখা সব সময় টানিয়া দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় উহারা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ নয়, প্রভেদ যাহা তাহা শুধু মাত্রাগত। অভ্যাস বেশী রকম অভ্যস্ত হইলেই আসিয়া দাঁড়ায় সহজাত বৃত্তিতে। অভ্যাসের পত্তন একটা যুগের আরম্ভে আর সহজাতবৃত্তির আরম্ভ বোধ হয় একটা কল্পের আরম্ভে—প্রথমটি মানুষের প্রাণে কিছু বাহিরের স্তর ছুঁইয়াছে, দ্বিতীয়টি আরও একটু ভিতরে গিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু দুইটির কোনটিই যে মানুষের নিবিড়-তম সত্তার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এমন বলিতে পারি না! দ্বিতীয়তঃ আমরা

যাহাকে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম বলিয়াছি, তাহা প্রত্যেক মানুষই ভিতরে ভিতরে অথবা ভিতরের সত্য বলিয়া স্বীকার ত করেই, তা ছাড়া বাহিরে সমাজ প্রতিষ্ঠানে কখন কোথাও তাহার যে প্রকাশ হয় নাই বা তাহার স্থাপন চেষ্টা হয় নাই, এ কথাও বলা যায় না। ধর্ম্মরাজ্য বা Utopia যে মানুষের কল্পনাতেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই। আর কোথাও না হউক, অন্ততঃ আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, বৌদ্ধসঙ্ঘ, খৃষ্টীয় চর্চ্চে এই রকম একটা শুদ্ধতর গোষ্ঠী-বন্ধনের ইঙ্গিতই কি পাই না? হইতে পারে, এখানে জিনিষটি ছিল সংকীর্ণ, উহার কর্ম্মক্ষেত্র অল্পপরিসর, উহা সমাজকে লইয়া নয়, সমাজের বাহিরে আর একটা সমাজ গড়িবার প্রয়াস আর সেই জন্যই পূর্ণ ফলদায়ক বা বেশী স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের কথা, মানুষের মধ্যে সংঘর্ষাত্মক সমাজ নহে, মিলনাত্মক সমাজ গড়িবার প্রেরণাও একটা স্বভাব, দ্বন্দ্বই মানুষের স্বভাবের শেষ বা সম্পূর্ণ তথ্য নহে।

সন্ন্যাসীরা সমাজের বাহিরে এক রকম দেব-সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সমাজের ভিতরে ঐ দেব-সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিতেন, তবে বোধ হয় আরও বেশী সফল হইতেন। দেব বা আধ্যাত্মিক সমাজকে গড়িয়া যদি উঠিতে হয় তবে দরকার দুইটি জিনিষ, দুইটি দিক হইতে যুগপৎ দুইটি শক্তির প্রয়োগ বা খেলা। প্রথমতঃ ভিতরের দিক, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে চাই একটা শুদ্ধি, মনকে প্রাণকে নূতন শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠায় ভরপুর করিয়া তোলা, একটা দেবভাবের আবির্ভাব, আত্মার প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ বাহিরের দিক অর্থাৎ ভিতরের ভাবটিকে জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে ফলাইয়া ধরিবার জন্য সুযোগ সুবিধা অবকাশ রচনা করিয়া দেওয়া, প্রতিষ্ঠান সকলকে নূতন ভাবের উপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে থাকা। আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রথমটির উপর সব জোর দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়টির উপর নজর দেন নাই, তাই সমাজ প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, ভিতরের ভাবটিও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অতি সঙ্কুচিত হইয়া মলিন ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আর আধুনিক কালে সোসিয়ালিষ্ট ও বোলসেভিকগণ জোর দিতেছেন বাহিরের কাঠামটির উপর, এই জন্য তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল যে হইবেন এমন মনে হয় না।

আমরা ভিতরের দিকের কথাটা আপাততঃ বলিব না। বাহিরের দিকের সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই। ভিতরটা তৈয়ারী হয় ভিতরের জোরে আত্মগত সাধনায়, একথা সত্য হইলেও বাহিরের বিধানও যে এই ভিতরের সাধনার সহায়,

তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বাহিরের সুযোগ ও সুবিধা, ভিতরের আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ যখন একটা গোষ্ঠী বা সমষ্টির নূতন দিকনির্ণয়, স্বভাবের পরিবর্ত্তন চাই তখন বাহিরের ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী হইয়া পড়ে। সুব্যবস্থা সহজেই সুপ্ত আত্মাকে, মানুষের আপাততঃ কল্পনাগত আদর্শকে, ভিতরের নিবিড়তম ভাবকে প্রকাশিত করিবার জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ধারা খুলিয়া দেয়, অন্ততঃ সম্ভাবনার মাত্রাকে বাড়াইয়া দেয়। অন্যপক্ষে কুব্যবস্থা ভিতরের ভাবকে চাপিয়া রাখে, নিস্তেজ করিয়া ফেলে —অনেক সময়ে দেখা যায়, ভাব ভিতরে পাকা হইলেও বাহিরের দুর্ব্যবস্থার কঠিন আবরণ একটা তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকাশ হইতে দিতেছে না। বলা যাইতে পারে অবশ্য, ভিতরটা ঠিক হইয়া আসিলে বাহিরটা আজ না হউক কাল নিশ্চয়ই ঠিক হইয়া আসিবে, তাহা যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে ভিতরটা এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু আমরা বলি ভিতর ও বাহির এরকম ছাড়াছাড়ি নয়—ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিয়া আনিতেছে যেমন সত্য কথা, সেই রকম বাহিরও ভিতরকে প্রকাশ করিয়া আনিতেছে সত্য কথা—বিশেষতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত সাধনার কথা নয়, কিন্তু সমষ্টিগত সাধনার কথা। মানুষের স্বভাব যেমন সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়াছে, তেমনই এই সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপই সেই স্বভাবকে গড়িয়া না তুলুক অন্ততঃ বজায় রাখিয়াছে। বোলশেভিকগণ বলেন মানুষের চিরন্তন স্বভাব বলিয়া কিছু নাই, মানুষের স্বভাব হইতেছে অভ্যাসের ফল, এক রকম সমাজে এক রকম ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে থাকিতে মনুষের এক স্বভাব হইয়াছে, সেই সমাজ সেই ব্যবস্থা উলটাইয়া দাও, সে আবার নূতন সমাজে নূতন ব্যবস্থায় থাকিতে থাকিতে নূতন অভ্যাস নূতন স্বভাব আহরণ করিবে। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না—কিন্তু ইহা যে আংশিক ভাবে সত্য তাহা বিশ্বাস করি।

ব্যক্তিগত অহংস্বাতন্ত্র্য,প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ কতখানি মানুষের অন্তরের প্রকৃতি, সনাতন স্বভাব—আদিম সত্তাগত পাপের (Original sin) ফল, আর কতখানি বাহিরের চাপ প্রয়োজনের তাড়না, গতানুগতিক অনুসরণেচ্ছার ফল তাহাও দেখিবার বিষয়। ক্ষেত্রজ্ঞ চাই অর্থাৎ যিনি আত্মাকে, নিজের গভীরতম উচ্চতম সত্তাকে চিনিয়াছেন, ধরিয়াছেন, সেখানে পাইয়াছেন অটুট শান্তি, বিশ্বের সহিত সম্মিলন সামঞ্জস্য ; কিন্তু সেই অনুরূপ ক্ষেত্রকেও চাই, পরে নয়, একই সাথে

—সমুচিত ক্ষেত্রই অনেক সময়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে সচেতন করিয়া তোলে, প্রকৃতির দাবীই অনেক সময়ে পুরুষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

আধুনিক যে সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে নিজেকে আত্মাকে চিনিবার সুযোগ মানুষ পায় না। তুমি আমি যে জীবন চালাই যে কর্ম্ম করি তাহা যেন ভিতরের সত্তার সম্পূর্ণ অনুমোদন পায় না, তাহা যেন ভিতরের আর একটা প্রেরণা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, এ যেন দশচক্রে পড়িয়া ভগবানের ভূত হইয়া যাওয়া। আমার ভিতরের আনন্দ অনুসারে আমার জীবন-প্রতিষ্টান আমার কর্ম্মজগৎ রচিত হইতেছে না, জীবনের কর্ম্মের একটা ধরা-বাঁধা কঠিন নিরেট ছাঁচের মধ্যে আমাকে ঢালাই হইতে হইতেছে, যাহা কিছু আনন্দ এই রকমে জোর করিয়া পিষিয়া তবে বাহির করিতে হইতেছে। সমাজ-আয়তনে কয়েকটী মাত্র বড় বড় রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, চলিতে ফিরিতে হইলে সকলকেই সেই কয়েকটিকে আশ্রয় করিতে হইবে। জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি জিনিষকে প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু সে সকলকে অপ্রয়োজনীয় বোধে একপাশে হয়ত আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেককে তাই নিজের বহু অঙ্গ অকাজের বলিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইতেছে, একই রকম ছাঁচের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে; পথের প্রাচুর্য্য নাই, প্রত্যেকের ধরণ ধারণও এক রকমের হইয়া পড়িয়াছে, ফল যে হইবে সংঘর্ষ অহংমত্ততা তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

আমি কবি-প্রাণ, কিন্তু আমাকে হইতে হইতেছে দর্শনের প্রফেসর অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদক। আমার আছে চিন্তাশক্তি, কিন্তু আমাকে করিতে হইতেছে কেরাণীগিরি। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমি প্রতিভা দেখাইতে পারি, আমাকে হইতে হইতেছে উকিল। আমি রাজ্য চালাইতে পারি, কিন্তু খাটাইতেছি কুলি। এই রকম একটা ভীষণ বর্ণশঙ্কর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়াছে। নিজের ভিতরের দিকে তাকাইবার কাহারও অবসর নাই, নিজের আনন্দ কোথায় ও কিসে, নিজের সহজ ধর্ম্ম কি, অন্তরাত্মার গতি ও প্রেরণা কোন দিকে তাহা দেখিবার বুঝিবার ফাঁক কোথাও পাই না, একটা ব্যস্ততার ত্রস্ততার ধূম ও কুহেলিকা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সব রন্ধ্র যেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, চারিদিকে তাহারই একটা নিবিড় নিরেট যবনিকা ঘিরিয়া রহিয়াছে। আপন আনন্দ আপন ধর্ম্ম বুঝি না, সম্মুখে যাহা পাইতেছি, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই একটা বিপুল ঘূর্ণীবায়ুর পাকে পাকে আপনহারা হইয়া ছুটিয়া

চলিয়াছি। স্বধর্ম্ম পাইতেছি না, পাইতে চাইতেছি না, সকলের ঘাড়ে চাপিয়াছে একটা পরধর্ম্ম, তাই আসিয়াছে দিবানন্দ, সঙ্ঘর্ষ। নিজেকে আত্মাকে ধরিয়া জীবন সৃষ্টি করিতেছি না, আনন্দ নয় লাভ, স্বধর্ম্ম নয় স্বার্থই হইয়াছে কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই জীবনে কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে মিথ্যাতার কৃত্রিমতা ক্ষুদ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দৈন্য ও গৃধ্নুতা।

কিন্তু সমাজের কাঠামকে ছাঁচকে যদি এমনভাবে বদলাইয়া দিতে পারি, যে প্রত্যেকে আপন আনন্দের পথটি অনুসরণ করিবার, নিজের ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিবার, নিজের অন্তরাত্মাকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় তবে দেখিব শুধু লাভের স্বার্থের পথে আর কেহ তত সহজে চলিতে চাহিতেছে না। সমাজের গঠন যদি এমন হয় যে তাহা কেবল কয়েকজনের, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় পরন্তু নির্ব্বিশেষে সকলের প্রত্যেকের জন্য, সমাজ-ব্যবস্থা যদি এমন উদার হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে, প্রত্যেকব্যক্তির দেয়কে এমন কি অলসের আলস্যকে পর্য্যন্ত* - গ্রহণ করিতে পারে, আপন স্থিতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যবহারে লাগাইতে পারে, তবে দ্বন্দ্বের সঙ্ঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন, আপন ধর্ম্ম আপন কর্ম্ম রচিয়া প্রত্যেকেই সমাজের ভাণ্ডারে আনিয়া দিতেছে নূতন নূতন সম্পদ। বর্ত্তমান সমাজে কিন্তু সম্পদ কেউ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—নূতন ত দূরের কথা, সকলেই যোগাইতেছে ভেজাল; ভেজালে কে কত চালাকী করিতে পারে তাহা লইয়াই চলিয়াছে মারামারি লাঠালাঠি। কিন্তু অন্তরাত্মার ধনসৃষ্টিতে সংঘর্ষ নাই, কারণ সেখানে বৈষম্য নাই, সকলেই সেখানে সমান, সকলের সৃষ্টিরই সমান মর্য্যাদা সমান মূল্য—পরের ধনে সেখানে আমরা ঈর্ষান্বিত নই, কারণ নিজের ধনেই তখন আমরা প্রত্যেকে ধনী।

এ সমাজ-ব্যবস্থা আসিবে কেমন করিয়া, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? সমাজ-ব্যবস্থার যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে ভাবে, যে হেতুতে এই নূতন পরিবর্ত্তনও হইবে সেই ভাবে, সেই হেতুতে। বাহিরে প্রাচীন ব্যবস্থার অসম্ভব অসহ্য চাপ আর ভিতরে সমষ্টিগত অন্তরাত্মার একটা নূতন মুক্তির প্রেরণা, ফলে সেই

---

* Cf. Bertrand Russel, "Roads to Freedom"—পৃঃ ১১৪, ১৭৯-১৮০। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমাদের আরও বলিবার রহিল।

চাপ ও প্রেরণার মাত্রা অনুসারে একটা ওলট পালট ও নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি। ইহা অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

এই সমষ্টিগত অন্তরাত্মার উদ্বোধন, এই সমাজগত নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা হয় বোধ হয়ত প্রথমে কয়েকটি ব্যষ্টির মধ্যে, অগ্রনী যাঁহারা, ভবিষ্যতের প্রতিনিধি যাঁহারা, দৃষ্টি যাঁহাদের মুক্ত, শ্রদ্ধা যাঁহাদের অটুট, সাহস যাহাদের দুর্জ্জয়, শক্তি যাঁহাদের অমিত, সাধনা যাঁহাদের অখণ্ড।

বিশ্বরূপ।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

কনকাঞ্চল ছড়ায়ে পড়িল একদা বসন্ত প্রভাতে
বিশ্বের এই সভাতে,
শাখে শাখে শাখে আবাহন-গান
কোকিলকণ্ঠ-কুহরিত তান
শিহরিত দিক স্নিগ্ধ মলয় বাতাসে
সুন্দর সেই আকাশে।

আম্র-মুকুল-গন্ধ মদিরা ছেয়েছে পবনে পবনে
এ শান্ত চারু লগনে,
সে মদিরা পানে অলিকুল ভোর।
মুছি আঁখি দুটী খুলি দিয়া দোর
বাহির হইনু দাঁড়াতে গগন তলাতে
সুন্দর সেই প্রভাতে।

সহসা একি রে বাধন-গ্রন্থি হৃদয়ের গেল টুটিয়া!
জগত আসিল জুটিয়া!
পিক-কুল-তান অলিকুল গীতি
গাহে তারা একি শুধু মোর স্তুতি।
আম্র-মুকুল-গন্ধ-মদিরা বিস্তৃত এই দেহীতে
আমি ঢাকা সেই মহীতে!

বাক্‌হীন ওই নভোমণ্ডল নামিল আমাতে আসিয়া
কহিল আমারে হাসিয়া
তুমি আছ তাই আছে মোর স্থান
তুমি চলে গেলে জীবনের দান
রবে না আমার; হব না দীপ্ত আলোকে
প্রভাতের এই পুলকে;

চেয়ে দেখ এই অন্তরে মোর প্রত্যেক পরমাণুটী
তব মূরতিরই অনুটী
অঙ্কিত কত চিকণ জালে
পড়ে থাকে তাই দৃষ্টি আড়ালে
তুমি হাস তাই আমি হাসিময় আভাতে
সন্ধ্যা উষায় নিশাতে।

একি মোর রূপ দেখালে আজিকে হে মোর হৃদয়-দেবতা,
একি অদ্ভুত বারতা!
জুড়ে আছি এই বিশ্বের সভা!
দীপ্ত আলোকে সে যে মোরই প্রভা!
গগন পবন হাসে শুধু আমি হাসি যে
আমি-ময় চারু মহী এ!

সাহিত্যে অনুভূতি।

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম, এ]

শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্যে স্বভাবতঃই একটী পার্থক্য রহিয়াছে এবং সাহিত্যকে শিল্প হিসাবে বিচার করিতে চাহিলে এই পার্থক্যটী সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি জড়প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

জগতের অথবা বাস্তবের বহিঃপ্রকাশের উপর এবং এই বহিঃপ্রকাশকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতিরিক্ত করিয়া তুলিলেও, ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া গেলেও,—ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞান জ্ঞানের সীমা বাড়াইয়া চলিয়াছে। শিল্পসৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে, সে বহিঃপ্রকাশকে সত্যের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অধ্যাত্মসত্তার সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে,—ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে চায়;—বাহিরের বাস্তবতা পর্য্যন্ত অধ্যাত্মজীবনের প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া পড়ে। *

বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত সাহিত্যের যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাহার একটী কারণ এই যে এইরূপ সত্যে মানুষের হৃদয় শান্তি পায় না। জড়বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও তাহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা যেন সত্যের স্বরূপ তাহার নিকট ধরা পড়িতেছে না। সেই জন্য কেবল জ্ঞানের দিক হইতে,—দর্শন ও বিজ্ঞানের রীতিতে,—সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে অন্য কোনও প্রণালীতে, অনুভূতির দ্বারা, ভাব ও কল্পনার সাহায্যে, হয়ত বা প্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টি লইয়া, সত্যের সহিত একটী নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়, তাহাকে অধিগত করিয়া আপন করিয়া লইতে চেষ্টা করে। আমাদের বাহিরে ও ভিতরে প্রাণের যে লীলা নিত্য স্ফুরিত হইতেছে, জ্ঞানের দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে আমরা পারি না, অথচ ইহাকে মূর্ত্ত করিয়া দেখিবার, স্ফুটতর করিয়া ধরিবার আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা তাহারও নিবৃত্তি নাই। † এই

* "In Art, the sensuous is spiritualized, i. e. the spiritual appears in sensuous shape". "Art liberates the real import of appearances from the semblance and deception of this bad and fleeting world, and imparts to phenomenal semblances a higher reality, born of mind." "Genuine reality is only to be found beyond the immediacy of feeling and of external objects." "The higher an artist ranks, the more profoundly ought he to represent the depths of heart and mind" Hegel's Introduction to Fine Arts, translated by Bosanquet.

† "It is to the very inwardness of life that intuition leads us." "The intention of life, the simple movement that runs through the lines, that binds them together and gives them significance escapes it (i. e., our eye or Intellect) This intention is just what the artist tries to regain, in placing himself back within the object by a kind of sympathy in breaking down by an effort of intuition, the barrier that space puts up between him and his model." Bergson's Creative Evolution.

আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা মানুষকে সর্ব্বদাই শিল্পসৃষ্টিতে নিয়োজিত করে এবং স্থূল বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। বহিঃপ্রকাশ লইয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আলোকচিত্র লইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইবার পর চিত্রশিল্পের কোনও সার্থকতা থাকিত না এবং সাহিত্য আমাদের নিকট শুধু কল্পনার খেলা, অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইত; মনোবিজ্ঞান ও সমাজনীতি পাঠ শেষ করিয়া সেক্ষ-পিয়রের নাটক পড়িবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতাম না; কিম্বা ছায়াবাজী পুতুলের নাচ দেখিয়া যেমন আমোদ উপভোগ করি, সেইরূপ একটী ক্ষণিক মোহের তাড়নায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইতাম; এবং তাহা হইলে আজ রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পূজিত হইত না। ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গভীরতম সত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই, ইহার মিথ্যা কল্পনাও বাস্তব জীবনের সত্যের চেয়ে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও মূল্যবান্; —অতীত ভারতের সমস্ত ইতিহাস বিলুপ্ত হইলেও প্রাচীন ভারতের আত্মা চিরকালের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল এই মানবজীবনের প্রকৃত বাস্তবতা অন্তরের রাজ্যেই মিলিতে পারে এবং বাহিরের বাস্তবতাও সেইখানে গেলে নিত্য বস্তুতে পরিণত হয়, নতুবা শুধু বহিঃপ্রকাশ লইয়া আমাদের কোনও তৃপ্তি নাই!

এমন কি বাহ্যপ্রকৃতিকেও, বাস্তবকেও,—জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে গিয়া আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না,—প্রত্যেক জিনিষকে বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডিত করিয়া ফেলি; তাহার নিজের সত্তা হারাইয়া তাহার গুণগুলিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাহিত্যিক এইরূপ জ্ঞানসৃষ্ট জগতের সহিত প্রাণের সম্পর্ক পাতাইতে চান,—প্রত্যেক জিনিষের বিশিষ্টতা ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। শিল্পসৃষ্টি একদিকে যেমন বহির্জগতের বাস্তবতাকে অধ্যাত্মসত্তায় মিশাইয়া বাহেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই বহিঃপ্রকৃতির এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। যিনি শিল্পী তিনি তাঁহার বিষয়ের সহিত অভেদাত্মবোধ করেন বলিয়া বিষয়টীকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারেন, ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া গুণরাশিতে পর্য্যবসিত হয় না *। আমরা যাহাকে বাস্তব বলি

* "One must transport one's self by an effort of sympathy to the interior of that which becomes" Bergson "The intelligence aims at the universal, the law, the thought and notion of the object * * * It

অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা যাহা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ব্যক্ত,শিল্পী তাঁহার একপ্রাণতা লইয়া তাহার ভিতরের স্বরূপটী, অন্তরের স্পন্দন,— তাহার মধ্যে সৃষ্টির যে একত্ব ও বিশিষ্টতা দীপ্যমান, সেইটীকে অনুভব করিবার চেষ্টা করেন, অনুভূতির সাহায্যে প্রত্যেক জিনিষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। পদার্থের এই যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য—ইহাকে জ্ঞানে স্ফুট করা যায় না এবং অন্যদিকে শিল্পসৃষ্টিতে অধ্যাত্মসত্তার রূপে যে অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—ইহাও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য শিল্পী অথবা সাহিত্যিক মুখ্যতঃ জ্ঞানের কথা বলেন না,—তিনি তাঁহার অনুভূতির গভীরতা সৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলেন ;—এবং সমালোচক ও পাঠক তাহাদের রুচির বিভিন্নতা অনুসারে অনুভূতিমূলক এই অখণ্ড সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্ঞানলব্ধ সত্যে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে।*

সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে এমন কি প্রাত্যহিক জীবনে এই অনুভূতি যে কতরূপেই প্রকাশ পাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বালকের ক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম শিল্পসৃষ্টিতে জ্ঞানের চেয়ে অনুভূতিই বিশেষভাবে বিদ্যমান। সৃষ্টির উদারতা, তাহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, যখন মানব-হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে টানিয়া লয়,—কোন অজ্ঞাত মহত্ত্বের সূচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে,—তখন সেই ভাব কত ধর্ম্মে, কত সাহিত্যে, কত সঙ্গীতে, কত দেবালয়ের ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে যে নিজেকে ব্যক্ত করে কে বলিতে পারে? মানুষ মানুষের সঙ্গে চিরকালই মিশিতেছে, প্রীতি ও ও প্রেমের সূত্রে পরস্পরকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে—দেনা পাওনা, আনাগোনা মেলামেশার অন্ত নাই,—কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ত সরল হইয়া উঠে না, একটী চরিত্রও কেন আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না? শিল্পী যখন তাঁহার একপ্রাণতা লইয়া মানুষের দিকে তাকান্,—অনুভূতির দ্বারা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন,—তখনই সে সজীব, মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে, সৃষ্টির বিশিষ্টতা

transforms it within the mind, making a concrete object of sense into an abstract matter of thought and so into something quite other than the same object." Hegel.

* "Nor is it a scientific productive process which passes from sense to abstract ideas or thoughts ; rather the spiritual and the sensuous side must in artistic production be as one" Hegel's Aesthetiks.

তাহাতে প্রকাশ পায়,—শিল্পীর প্রাণের বেগ তাহার চরিত্রের বিভিন্ন প্রকাশকে সংযুক্ত করিয়া ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। ইংরাজ-কবি সেক্সপিয়র এমনই করিয়া তাঁহার সৃষ্টচরিত্রের মধ্যে নিজেকে লোপ করিয়া দিয়াছেন যে আজ তাঁহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনেকের চক্ষেই পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, যে শস্যশ্যামল কোমলতা, প্রাণের যে অপার তৃপ্তি, ভোগের যে বিপুল বিরতি, শিক্ষার যে গূঢ় তত্ত্ব, লুক্কায়িত ছিল তাহা ধরা পড়িল যখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রাণের সুর মিলাইতে পারিলেন। কবির কথা প্রকৃতির ভাষা হইয়া দাঁড়াইল।

এমনই করিয়া শিল্পীর চক্ষে জগৎ নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতেছে,—এবং বাস্তব সত্তাকে অন্তরের আলোকে গভীরতর বাস্তবে পরিণত করিতেছে। ইহাকে জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেই তাহার সবটুকু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, যে জ্ঞানের ভিতর কোনও রন্ধ্র নাই,—কার্য্যকারণ পরম্পরার নিগূঢ় বন্ধনে যাহা আবদ্ধ,—যাহার কোথাও কোনও ফাঁক দেখিতে পাই না,—অনুভূতি যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না,—ভাবও কল্পনার লীলাভূমি হইতে যাহা সম্পূর্ণ-ভাবে অপসারিত,—সেইরূপ জ্ঞানের সহিত শিল্প বা সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর নহে।* হাজার চেষ্টা করিলেও কেহ অঙ্কশাস্ত্রকে সাহিত্যের বিষয়ী-ভূত করিতে পারিবেন না এবং অন্যান্য শাস্ত্র যতই অঙ্কশাস্ত্রের সান্নিধ্যে গমন করে, যতই জ্ঞানে স্ফুট হইয়া উঠে ততই সাহিত্য হইতে দূরে পড়িয়া যায়। সুখের বিষয় এই যে আমাদের সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা অঙ্কে, বৈজ্ঞানিক সত্যে, পরিণত হইতে এখনও বহু দেরী ;—যে দিন তাহা হইবে, সে দিন মানুষ শুধু নির্ব্বিকার জ্ঞান,—ভুলভ্রান্তিহীন, রাগমোহ-বিবর্জ্জিত কলের পুতুল, হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ একটী আদর্শ আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যে ক্রমশঃই স্থান পাইতেছে এবং বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে চাহিতেছে।

* Bergson's Introduction to Metaphysics. "What is true of Mathematics is true also of every study, so far forth as it is scientific, it makes use of words as mere vehicle of things, and is thereby withdrawn from the province of Literature. Thus Metaphysics, Ethics, Law, Political Economy, Chemistry, Theology cease to be literature in the same degree, as they are capable of a severe scientific treatment" Newman's Address on Literature.

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য কেবল জ্ঞানের উপর রঙ ফলান নহে। মনের সহজ অনুভূতি হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি ;—সেক্ষপিয়র যে বেকন্ অপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন,—এ কথা বলা যায় না অথবা এস্‌কাইলসে আরিষ্টট্‌লের পাণ্ডিত্য আরোপ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না ; কারণ তাঁহারা অনুভূতির গভীরতা দিয়াই,—অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে—সাহিত্য রচনা করিয়াছেন ;—জ্ঞানের কথা তাঁহারা বলেন নাই—প্রাণের ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন।* প্রতিভার একটী অব্যাখ্যাত রশ্মি সহসা বিচ্ছুরিত হইয়া প্রত্যেক সত্তাকে শিল্পীর সত্তায় পরিণত করে, এবং তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলে। কেমন করিয়া যে বিষয়ের সহিত এই সমপ্রাণতা স্থাপিত হয় তাহা বলা যায় না,—প্রতিভার অজ্ঞাত রহস্য বলিয়াই তাহাকে মানিয়া লইতে হয়।

জ্ঞান দিয়া ধরিলে সাহিত্যকে ঠিক বুঝা যায় না, কারণ জ্ঞান বিশ্লেষণমূলক। নীতিবাদী পণ্ডিতের পথ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সাহিত্য বুঝিতে চান, তাঁহাদিগকে শুষ্ক তর্কের মধ্যেই থাকিয়া যাইতে হয়। নৈয়ায়িক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের বাহিরের কথা, তাহার জ্ঞানের ভিত্তি, বলিয়া দিতে পারেন ; কিন্তু যে সরসতা যে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাহাতে প্রাণসঞ্চার করে, তাহার ধার তাঁহারা ধারেন না। কোনও কিছু বুঝিতে হইলে যে জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের বিচারে সত্যাসত্য, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়—সমস্তই বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। "সোণার তরীর" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি ? অর্থাৎ ঐ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ কোন্ আধ্যাত্মিক তত্ত্বটী

* "A poet is the most unpoetical of any thing in existence, because he has no identity ; he is continually in for, and filling, some other body". Keats's Letter to Woodhouse. "There are two modes of the apprehension of reality. The one way is the way of the understanding, the way of science. The other is intuition, insight, sympathy—the way of art." Wildon Carr's Philosophy of Change. "The specific genius of a poet does not lie in reflection but in imagination. Poetry is not the expression of ideas or of a view of life ; it is their discovery or creation, or rather both discovery and creation in one. Shakespeare's imagination gradually discovered or created in his stories a meaning and a mass of truth about life, which was brought to birth by the process of composition, but never preceded it in the shape of ideas, and probably never, even after it, took that shape to the poet's mind" Bradley's Oxford Lectures.

রূপকের সাজে সাজাইয়াছেন, ইহার বিচার সাহিত্য হিসাবে তেমন সমীচীন নহে। কারণ যদি কোনও কবিতা লিখিবার সময় কবির মনে কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অথবা সত্য স্ফুট হইয়া উঠে, তাহা হইলে শিল্পসৃষ্টিতে ভাব ও রূপের যে অখণ্ড মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই* তাহার মধ্যে যেন একটী ব্যবচ্ছেদ আসিয়া পড়ে,—রূপকে আর ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, একটীর সহিত আর একটীর প্রাণের সম্পর্ক থাকে না,—রূপ ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় ;—সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য এইরূপ কবিতাতে থাকিতে পারে না। কবি তাঁহার সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা লইয়া, প্রাণ দিয়া, বর্ষার একটী বিশেষ চিত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন ; তখন যে সুপ্ত চেতনা, যে অনুভূতির গভীরতা তাঁহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল; হৃদয়ের যে অব্যক্ত বেদনা, জীবনের যে ব্যর্থ সাধনা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল, হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তে বাহিরের একটী চিত্রের সংস্পর্শে কেমন করিয়া যে তাহারা মূর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—কবি নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই ; এবং সেই জন্য শুধু ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়া নহে,—এমন কি প্রাকৃতিক কোনও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াও নহে,—কিন্তু অনুভূতি দিয়া, কবির সুরের সহিত সুর মিলাইয়া—"সোণার তরী" বুঝিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস যদি গীতার ব্যাখ্যা অথবা নৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য নিতান্তই অল্প হইয়া যায়। মানব-চরিত্রকে গুণের সমষ্টি করিয়া দেখা সাহিত্য-সৃষ্টি নহে,—ভিতর হইতে বাহিরে চরিত্রের স্ফুরণ, অনুভূতি দিয়া চরিত্রের গতি-নির্দ্ধারণই সাহিত্যের অঙ্গ। বাস্তবিক, সাহিত্যিক গুণের চেয়ে জিনিষের সত্তাকেই বিশেষ করিয়া ধরিতে,—প্রত্যেক বিষয়ই সমগ্রভাবে দেখিতে চেষ্টা করেন ; কাজে কাজেই তাঁহার দৃষ্টিতে পাপের পঙ্কিলতার মধ্যেও স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা লক্ষিত হইতে পারে। সামাজিক অথবা নৈতিক মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় মাপিয়া লওয়ার

* "It would be possible in poetical creation to try and proceed by first apprehending the theme to be treated as a prosaic thought, and by then putting it into pictorial ideas, and into rhyme, and so forth ; so that the pictorial element would simply be hung upon the abstract reflections as an ornament or decoration. Such a process could only produce bad poetry for in it there would be operative as two separate activities that which in artistic production has its right place only as undivided unity" Hegel.

চেষ্টা বৃথা, কারণ ঐগুলি সাহিত্যিকের নিকট পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হয় না, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া বিকাশের মধ্য দিয়া সৃষ্টির একত্ব সম্পাদন করে, আর সমাজ নিজের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে এগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতে বসে।

সাহিত্যিক কোনও "নৈতিক সমস্যা" পূরণ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি মানুষকে তাহার লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতির চেয়ে বড় করিয়া দেখেন, তাহার স্বভাবের প্রকাশের চেয়ে তাহার স্বভাবকেই বেশী করিয়া মানেন। তিনি জানেন যে জিনিষের প্রকৃত সত্তা, তাহার সমগ্রের একটা অনুভূতি ছাড়া শুধু বহিঃপ্রকাশে ধরা পড়ে না। মনুষ্য-চরিত্রের গুণাবলী একত্রিত করিয়া এবং কর্ম্মজীবনের একটী সম্পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াও মানুষকে পাওয়া যায় না। সাহিত্যে শিল্পীর অধ্যাত্মসত্তা অনুভূতিলব্ধ স্বভাবসৃষ্ট মনুষ্যের মধ্য দিয়াই মুখ্যতঃ প্রকাশ লাভ করে। সৃষ্টির মহত্বই এই যে শত অপূর্ণতা, দোষ ও অন্ধকার স্বচ্ছন্দে ধারণ করিয়া সে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তাহার অপূর্ণতা তখনই বুঝিতে পারি, যখন তাহাকে সমগ্র হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখি। সৃষ্টির অর্থাৎ বিকাশের দিক হইতে দেখিলে ধুতুরার ফুলও যেমন সম্পূর্ণ, গোলাপও তেমনই সম্পূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া ধুতুরার বাহিরের সৌন্দর্য্য গোলাপের মত নহে। উভয়েতেই যে শক্তিগুলি সমন্বিত হইয়া বিকাশ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের এই বিকাশের ধারাতে কোনও অসম্পূর্ণতা আসিতে পারে না—কারণ যে পরিণতির সমাপ্তি ইহাতে দেখিতে পাই তাহার পক্ষে আর অন্য কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে জর্ম্মান কবি গ্যয়টে প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা আরোপিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের ওথেলা-চরিত্র যেমন অমোঘসূত্রে গ্রথিত আয়াগো-চরিত্রও তদ্রূপ। অন্তরের সম্পূর্ণতা উভয়েরই আছে। আদর্শ দিয়া বিচার, বাহির হইতে বিচার—এইরূপ বিচারে সাহিত্যকে সব সময়ে ঠিক বুঝা যায় না। শিল্প সৃষ্টি মাত্রেই যে সম্পূর্ণতা আছে বাহির হইতে দেখিলে, শুধু জ্ঞানের সাহায্যে—তাহার সম্যক উপলব্ধি না হইতে পারে, কারণ ভিতর হইতে দেখিয়া, বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে বুঝিতে হয়! পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সাহিত্যে নাও থাকিতে পারে কিন্তু এই অন্তরের সম্পূর্ণতা, সাহিত্য যদি শিল্পসৃষ্টি হয়, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে। সেক্সপিয়রের সাইলক-চরিত্র যখন খৃষ্টীয় সমাজের সম্পর্কে বিচার করিতে বসি তখন তাহা অসম্পূর্ণ, পাপদুষ্ট ও ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হয়। আবার

যখন সেই চরিত্রকে ভিতর হইতে দেখি, শিল্পীর একপ্রাণতা লইয়া চরিত্রের গতিটী নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করি;—শত শতাব্দীর অত্যাচার পুঞ্জীভূত হইয়া কিরূপে যে ন্যায় ও আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহাকে যদি মূর্ত্ত করিয়া দেখিতে চাই,—তখন সেই চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি ধরা পড়ে এবং এক অজানিত মহত্বে সে চরিত্র ভরিয়া উঠে,—তখন তাহা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ। ভিতর হইতে দেখিলে রোহিণী-চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ইহা নহে যে সে অসতী হইয়াছিল, কিন্তু যখন রোহিণী তাহার সুখ-লালসার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া গোবিন্দলালের নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিল, তখন দেখিলাম তাহাকে হত্যা করিবার বহুপূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আত্মাকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার দেহের মৃত্যু তেমন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হইল না। রোহিণী-চরিত্রের এই অসম্পূর্ণতায়, তাহার অন্তরের এই দৈন্যে কোনও অবশ্যম্ভাবিত্ব দেখি না, কারণ তাহার চরিত্রের বিকাশ দেখিয়া এ কথা অনুভব করিতে পারি না, যে, ইহা ছাড়া আর কিছু হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সামাজিক হিসাবে ধরিলে, নীতির মানদণ্ডে মাপিয়া লইতে গেলে, কপালকুণ্ডলা-চরিত্র অসম্পূর্ণ,—নারীত্বের অর্দ্ধবিকাশ;—কিন্তু যখন বাহিরের সমস্ত সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অন্তরের মহিমাটুকু, তাহার স্বভাবের পরিণতি অনুভব করিবার চেষ্টা করি, তখন সে চরিত্রের সম্পূর্ণতা উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই একটী সম্পূর্ণতা, একটা বিকাশের পরিণতি দৃষ্ট হয়,—তাহা হইতে কিছু বাদ্ দিলে অথবা তাহাতে কিছু যোগ করিলে তাহার প্রকৃতিই ভিন্ন হইয়া যায়; সে তাহার সমগ্র সত্তা লইয়া, স্বপ্রকৃতির অনুগামী হইয়া যে সঙ্গতিতে ও সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠে, তাহাকে তাহার নিজের দিক হইতে বিচার করা চলে না; এবং সাহিত্যিক তাঁহার সহানুভূতিমূলক কল্পনা দিয়া সেই বিকাশের সৌন্দর্য্যটীকেই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, ন্যায়ের আসনে বসিয়া তাহাকে বিচার করিতে চান না,—জীবনের সুবিধা অসুবিধার দ্বারা তাহাকে খর্ব্ব করেন না। বহুবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া যে বিকাশের সমন্বয় সাধিত করে এবং যে একত্বে ও বৈশিষ্ট্যে পরিণতিলাভ করে তাহাকেই সৃষ্টি বলিতে পারি এবং দেখিতে গেলে যেখানে সৃষ্টি সেখানেই সৌন্দর্য্য, তাহা অন্তর্জগতেই হউক আর বহির্জগতেই হউক। সৌন্দর্য্যের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না,—যাহা সুন্দর তাহা সুন্দর ইহা ছাড়া আর কিছু বলা উচিত নহে,—তবে এইমাত্র বলিতে হয় যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি আছে এবং সৃষ্টির মূল ভাবটীও

তাহাই।* বিজ্ঞান সৃষ্টির এই সঙ্গতি জ্ঞানে স্ফুট করিতে চায়, শিল্পী বা সাহিত্যিক ইহাকে রূপে অভিব্যক্তিপ্রদান করিয়া ভাবের উদ্রেক করে। এই অর্থে সত্য ও সৌন্দর্য্য এক। শকুন্তলা-চরিত্র একটী সৃষ্টি;—অর্থাৎ অন্তরের সহিত বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাত,—কিম্বা কতকগুলি বিশেষ শক্তির সমন্বয়ে চরিত্রের যে ঐক্যে ও বৈশিষ্ট্যে পরিণতিলাভ করিয়াছে তাহা যেমন আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া দেয়; আর একদিকে শকুন্তলা নাটকও তেমনই সৃষ্টি কারণ এখানেও ঠিক্ সেই একই প্রকারে ভাবের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমালোচক বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া এই শক্তিগুলিকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে গুণে পরিণত করিয়া আড়ষ্ট করিয়া ফেলেন। সাহিত্যিক ভিতর হইতে শক্তির এই লীলাভিনয় অনুভব করিয়া বাহিরে সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি স্বরূপ তাহাকে উপলব্ধি করেন। সেই জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাণের যে স্ফূর্ত্তি আছে,—সৃষ্টির যে আনন্দ ইহাতে সদা সাহিত্য প্রবাহিত,—তাহা অনুভূতি ছাড়া সমালোচনায় ঠিক ধরা যায় না।

সৃষ্টির এই অন্তর-মাধুর্য্য সহসা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; কারণ-অভ্যাসের জড়তা ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। শিল্পীর মুক্ত আত্মা যতই এগুলি কাটাইয়া সৃষ্টির রহস্য অনুভব করিতে পারে, সাহিত্য ততই সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে। জীবনের সামান্য সামান্য দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে অথবা বাহ্য-প্রকৃতির অতি তুচ্ছ প্রকাশের ভিতর যে কত ভাব ও সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হইত না, যদি শিল্পীর অনুভূতি আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া না দিত। সাহিত্য এইরূপে মুক্তির স্বাদ বহিয়া আনে,—মনুষ্য-চেতনা মুক্ত করিয়া, প্রসারিত করিয়া দেয়। বৈদিক ঋষিরা প্রভাতের সূর্য্যোদয়ে, উষার অরুণ আলোকে যে মহৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন,—তাহা আমাদের জীবনের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে, সেই বিস্ময় ও আনন্দ আমাদের প্রাণে জাগে নাই, তাহার মধ্যে কোনও অপরূপত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কখন্ কোন্ জিনিষ যে কেমন করিয়া আমাদের দৃষ্টিতে অভিনব ও অপরূপ হইয়া উঠে আমরা বলিতে পারি না। যখনই কোনও বিকাশের ধারা শক্তির সমন্বয়, বা প্রাণের বেগ আমাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে, তখনই যেন সমস্ত তুচ্ছতা অপসারিত

* Balfour's Address on the Beautiful. "Reality is a perpetual growth, a creation pursued without end," Bergson.

হইয়া ভাবের প্রস্রবণ খুলিয়া যায় এবং অতিসাধারণ ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেও একটা নূতনত্ব দেখিতে পাই, তাহাদিগকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ্ ও রবীন্দ্রনাথের সামান্য বিষয়ের রচনাতেও যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তাহার ইহাই কারণ; এবং সেই একই কারণে সেক্ষপিয়রের অতিতুচ্ছ চরিত্রগুলির মধ্যেও প্রায়শঃই সৃষ্টির অপরূপত্ব লক্ষিত হয়।

বাস্তবিক, ভিতর হইতে যাহা সুন্দর, বাহির হইতে দেখিলে তাহাকে সব সময়েই সুন্দর বলা যায় না। অন্তর্দৃষ্টির অভাবে, অনুভূতি ছিল না বলিয়া, মেকলে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতায় সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই—এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই সাধারণ পাঠকের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টি যখন কোনও সত্তাকে বাহিরে স্ফুট করিয়া তুলে, তখন তাহার ভিতরকার সঙ্গতি বাহিরের বৃহত্তর সামঞ্জস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে। প্রকাশের সৌন্দর্য্য রূপে ও বর্ণে, বিকাশের মাধুর্য্য প্রাণের স্ফুরণে,—সংযত একটা গতির ক্রমিক আভাসে। প্রকাশের দিক, বাহিরের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এতই সহজে চক্ষে পড়ে যে শিল্পীর অনুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকে বিকাশের দিক্‌টা আমরা ধরিতেই পারি না। আমাদের উদ্যান-পুষ্পের বিচিত্র বর্ণ-সম্ভারে যে ফুলটী একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহার নিজের ভিতরেও যে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হিল্লোলিত, সে দিকে আমরা একবার তাকাইয়াও দেখিনা। মানুষকেও তেমনই পারিবারিক, সামাজিক, অথবা অন্য কোনও বৃহত্তর সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখি,—সেই জন্য তাহার চরিত্রের ভিতরের সঙ্গতি, বিকাশ-মাধুর্য্য, আমাদের নিকট সম্যক্ লক্ষিত হয় না। আদর্শের পূর্ণতার মধ্য দিয়া চরিত্রের প্রকাশ, আর আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ভিতর হইতে চরিত্রটী ফুটাইয়া তুলা—এ উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এবং একই সাহিত্যিক উভয় প্রকারেই যে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার কোনও মানে নাই,—কিন্তু ভিতরের এই সঙ্গতি, সৃষ্টির রহস্য, সাহিত্যে যত কম থাকে, ততই শিল্প হিসাবে তাহার মূল্য কমিয়া যায়। সুন্দর অসুন্দর, সুশ্রী কুশ্রী,—এইরূপভাবে জগৎকে বিভক্ত করিয়া লইতে পারেন তিনি,—যাঁহাতে অনুভূতির সম্পূর্ণতা আছে;—যিনি শুধু প্রকাশের মধ্যে নহে, বিকাশের দিক হইতেও সমস্ত পদার্থকে দেখিতে পারিয়াছেন। এই জন্য আদর্শের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্যের পরিমাপক নহে, এবং আদর্শ হিসাবে নিম্নতর চরিত্রেও সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই,—সাহিত্যেও যেমন, অন্যান্য শিল্পেও তেমন। মহা-

প্রাণ সক্রেটিস্ নাকি দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন,—কিন্তু প্লেটোর কাহিনীতে তাঁহার যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদি কোনও চিত্রকর তাঁহার চিত্রে অন্তরের সেই মাধুর্য্যটী কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিফলিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে চিত্র-শিল্পের সার্থকতা কোথায় ?

বাহিরটা আমাদের নিকট এতই স্পষ্ট যে কোনও পদার্থকে তাহার বাহিরের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমরা স্বতঃই ব্যষ্টির উপলব্ধি সমষ্টির মধ্য দিয়া পাইয়া থাকি। সেইজন্য সাহিত্যে দুই প্রকার সৌন্দর্য্যানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়—সমষ্টির আর ব্যষ্টির, প্রকাশের আর বিকাশের। পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্যের মধ্যে কর্ম্মের যে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়,—তাহা পাই রামায়ণে ;—বিরহ-বেদনার অন্তরগূঢ় তাড়নায় ভাব-বিকাশের যে মাধুর্য্য তাহা পাই মেঘদূতে। সাহিত্য একদিকে পরিবারে, সমাজে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে যে বহুবিধ শক্তির একত্র সমাবেশ তাহাদিগকে সৃষ্টির ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছে, আর একদিকে ব্যষ্টির বিকাশের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া সমষ্টির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপন করিতে চাহিতেছে। এই সমাবেশের মাধুর্য্য যেমন সহজেই আমাদের চক্ষে পড়ে, বিকাশের মাধুর্য্য তেমন সহজে ধরা পড়ে না,—কারণ একটীতে আমাদের যে সৌন্দর্য্যানুভূতি হয় তাহার ভিত্তি অনেকটা জ্ঞানের উপর,—অর্থাৎ আদর্শের স্থৈর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে। আর একটীতে ঐ সৌন্দর্য্য মুখ্যতঃ অনুভূতিমূলক,—ভাবের বিকাশে ও প্রাণের লীলার মধুর স্ফুরণে।

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে অনুভূতি ছিল না, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ অনুভূতি ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এবং ইহাও সত্য যে প্রাচীন সাহিত্য সর্ব্বত্র একই প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। কিন্তু মোটের উপর এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় যে প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞানের সহিত অনুভূতির একটা সামঞ্জস্য ছিল, এবং উভয়ের মধ্যে এই সঙ্গতি স্থিতিমান সমাজে যতটা সম্ভব গতিমান সমাজে ততটা সম্ভবপর নহে। সমাজের রূপ যেখানে শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আদর্শের স্থিরতা সেখানে আসিতে পারে না ; যেখানে প্রাণের গতি মুক্ত হইয়াছে, সেখানে ব্যষ্টিকে সমষ্টির গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চলে না। আমাদের দেশে কিম্বা পুরাতন গ্রীস ও রোমে, সমাজের ধর্ম্মের অথবা রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে বিযুক্ত করিয়া বক্তিত্বের উপলব্ধি তেমন হয় নাই। মানুষকে তাহারা ঠিক মানুষভাবে বুঝিতে ততটা চেষ্টা করে

নাই যতটা একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের কুক্ষিগত করিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছে ;—মনুষ্যত্বের বিকাশ সমাজ ধর্ম্ম কিম্বা রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংহত করিয়া রাখিয়াছে! এইরূপ সমাজে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির দ্বন্দ্ব রূঢ় হইয়া উঠে না,—সর্ব্বত্রই একটা শান্ত সংযত ভাব, বিরোধের একটা সমন্বয়, পরিণতির একটা বিপুল তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে ভাবের আতিশয্য, কল্পনার প্রাবল্য অথবা আবেগের বিহ্বলতা প্রায়শঃই নাই—তাহাতে ত্যাগের মধ্যে শান্তি, বৈরাগ্যের মধ্যে ভোগ। এ সাহিত্য সৃষ্টির অপরূপত্ব তত দেখে নাই, যেমন দেখিয়াছে সুশৃঙ্খলার সৌন্দর্য্য ; বিকাশের ধারা লক্ষ্য না করিয়া প্রকাশের দিকটা স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে ; সমাজের গতির বেগ সংযত করিয়া, স্থিতিকেই স্থায়িত্ব দিতে চাহিয়াছে। তখনকার সাহিত্যে অনুভূতি প্রাধান্যলাভ করে নাই কারণ যে বিকাশের ধারা আমরা এখন আমাদের জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি ; তাহা তখনও সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যেদিন হইতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ আরব্ধ হইয়াছে, সেদিন হইতেই সাহিত্যের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়াছে। ইংলণ্ডে অনুভূতিমূলক সাহিত্যের আরম্ভ জ্ঞানের নবযুগে, এবং ইহার বৃদ্ধি ব্যক্তিত্বের প্রসারের সহিত,—সেইকালে যখন এক অদম্য স্ফূর্ত্তি ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে সহস্রধা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সে ইহার আরম্ভ ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা রুসো—যিনিই প্রথম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন। আমাদের দেশে অনুভূতিমূলক সাহিত্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নাই তবে বঙ্গ সাহিত্যের গতি যে, এইদিকে একটু অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাণের আবেগে মানুষ যখন সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হয়,—পরম্পরাগত সংস্কার হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া ফেলে, তখন তাহার সাহিত্যে সংযম ও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। সে নিজের ভিতর যে অবারিত গতি অনুভব করে, যে বিকাশের মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহা অনুভূতি ছাড়া ধরা যায় না। এই উদ্বেলতা, মানসিক উৎসুক্যের এই চাঞ্চল্য আপনিই তাহাকে ভাব ও কল্পনার আতিশয্যে লইয়া যায় এবং সৃষ্টির অপরূপত্ব তাহার চক্ষে ফুটাইয়া তুলে।

প্রাচীন সাহিত্য যাহা চাহিয়াছিল তাহা অনেকটা পাইয়াছে, আধুনিক সাহিত্য যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না। প্রাচীন সাহিত্য ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির একটা সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে পারিয়াছিল ; আমরা ব্যষ্টির বিকাশ-মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া তাহার সহিত সমষ্টির সমাবেশ-মাধুর্য্য সংযুক্ত করিতে

চাহিতেছি; ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্ফুটতর করিয়া এক মহাসাম্যের সন্ধানে ফিরিতেছি, আমাদের একদিকে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ আর একদিকে রাষ্ট্রের বন্ধন; একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা আর একদিকে জগৎব্যাপ্ত শান্তি;—জীবনের প্রত্যেক চেষ্টার ভিতর এইরূপ একটা নিগূঢ় দ্বন্দ্বে আমাদের সমস্ত কর্ম্মই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে,—আমাদিগের কোনও দিকেই স্থিতি নাই, কেবল গতির আভাস। যে ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে তাহার সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানব সমাজ ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে,—চারিদিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া কিছুতেই যেন বৃহত্তর সাম্য স্থাপিত করিতে পারিতেছে না,—বৈষম্যকে কেন্দ্র করিয়া সাম্যের জন্য খুঁজিয়া মরিতেছে। এই সময়ের সাহিত্য স্বভাবতঃই অনুভূতি-মূলক হইবে; ইহাতে কর্ম্মের সম্পূর্ণতা, বৃহত্তর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য অর্থাৎ সমষ্টির সমাবেশ-মাধুর্য্য কিম্বা আদর্শের স্থৈর্য্য তেমন থাকিতে পারেনা, যেমন ইহাতে পাই বিকাশের সৌন্দর্য্য, অন্তরের সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা অর্থাৎ সৃষ্টির অপরূপত্ব বা অনির্ব্বচনীয়তা। এইরূপ সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে, ইহাকে বাহির হইতে দেখিলে চলিবে না;—ইহার কথা জ্ঞানে ঠিক্ স্ফুট করা যায় না; অনুভূতির সাহায্যে ইহার অন্তরের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে ও সমালোচনায় তেমন জটিলতা নাই; অনুভূতিমূলক সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য্য, সমালোচনার পর সমালোচনা বাড়িয়া গেলেও, হৃদয়ঙ্গম হইতে চাহে না। প্রাচীন সাহিত্যের শুদ্ধ শান্ত ভাব, সেই নির্ম্মল সংযত মাধুর্য্য, যেন শরতের জলহারা মেঘের শুভ্রহংসগতি,—এ সাহিত্য হইতে পাইবার চেষ্টা বৃথা:—ইহা হৃদয়ের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া বর্ষার জলদ-গম্ভীর স্বরে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলে,—ইহাতে কল্পনার কি প্রাবল্য, ভাবের কি উন্মাদনা; সমস্ত বন্ধন টুটিয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের আবরণ উন্মোচন করিয়া মত্ত ঝটিকার মত মনুষ্য-হৃদয়ের নগ্ন সৌন্দর্য্য ইহা প্রকাশ করিতে চায়,—প্রকৃতির গূঢ় কথা, মৌন সংবাদ,—ইহা কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করে,—সকলের অনাদৃতকে আদরে অন্তরে তুলিয়া লয়—এইরূপে মানসিক ঔৎসুক্যের তাড়নায়, আবেগের উচ্ছ্বাসে জীবনের কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া সম্পূর্ণতার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজেকে ক্ষয়িত করিয়া ফেলে,—ইহাতে নিবৃত্তি নাই, শান্তি নাই,—আছে কেবল প্রাণের অবারিত গতি, মুক্তির আনন্দ বিকাশের সার্থকতা।

সাহিত্য সৃষ্টিতে অন্তরের যে সম্পূর্ণতা দেখা যায়, বাহিরের আঘাতে—অবস্থার বিপর্য্যয়ে—তাহা খর্ব্ব হইতে পারে না। সাহিত্যের জয় পরাজয়,

সার্থকতা অসার্থকতা—কর্ম্মের কষ্টিপাথরে কষিয়া লওয়া যায় না। সংসারের ব্যর্থতা সাহিত্যের সার্থকতায় পরিণত হইতে পারে,—এখানে যাহা অবজ্ঞাত, সাহিত্যে তাহা আদৃত। যে পূর্ণতা সাহিত্যে প্রাণলাভ করে তাহা আমাদের সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। সাহিত্যিক অন্তরের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, বাহিরের জয়-নিনাদে তাঁহার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিত হয় না। মহাত্মা যীশু যেদিন কণ্টকের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, দুঃখ ও অপমানকে জীবনের সর্ব্বোত্তম রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার রুধির প্লাবিত মুখের দিকে তাকাইয়া, পদদলিত ধর্ম্মের সেই পরাজয় দেখিয়া,—কে মনে করিয়াছিল যে এক অপরূপ গৌরবে ধর্ম্ম মণ্ডিত হইয়া চিরকালের জন্য নরনারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল? কর্ডেলিয়া যেদিন পিতৃভক্তি ও প্রেমে প্রণোদিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন, সেদিন আমাদের মনে হইতে পারে যে তাঁহার সমস্ত জীবনই বৃথা হইয়া গেল। কারাগৃহে বৃদ্ধ লিয়রের হৃদয়-জ্বালার অসম্বন্ধ প্রলাপ চারিদিকে নৃশংসতার অট্টহাস—সেই গভীর দুঃখ ও শোকের মধ্যে সান্ত্বনার কিছু পাওয়া যায় না,—মনে হয় এ সংসার যেন শয়তানের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু কেমন করিয়া যে হৃদয়ের এই দৈন্য কাটিয়া যায় বলিতে পারি না:—শোকের সেই প্রলয়-ঝঞ্ঝা সমস্ত হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করিয়া যে প্রেম-জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলে তাহা স্বর্গে হইলেও মর্ত্ত্যের। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেমের সার্থকতা প্রেমে, যে পুণ্যের এমন একটী অজেয় শক্তি আছে যে পরাজয়ে ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না,—পাপের মলিনতা ইহাকে ম্লান করে না,—ইহা নিজের গৌরবেই নিজে মহিমান্বিত। আবার যে দিন ভ্রমর দীর্ঘ বিরহের অবসানে মৃত্যুর মিলন প্রতীক্ষায় বহুকাল হইতে অবরুদ্ধ তাঁহার সেই বাতায়ন খুলিতে বলিলেন,—সেদিন প্রেমের যে করুণ সুর তাঁহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল,—সাধের কুঞ্জকাননের শোচনীয় পরিণামে তাহার ঝঙ্কার নষ্ট হইল না, গোবিন্দলালের উপস্থিতিও তাহাকে নিবিড় করিয়া দিতে পারিল না। সে প্রেম যে নিজেকেই নিজে ভরিয়া দিয়াছিল,—গোবিন্দলাল ত তাহার উপলক্ষ্যমাত্র;—তাহার সাফল্য, বিকাশের মাধুর্য্যে, প্রকাশের তৃপ্তিতে নহে।

ক্রমশঃ।

কর্ম্মের বাঁশী।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

বনের পাখী খাঁচার পাখীকে পল্লীর আমবনে ধানের ক্ষেতে ফিরতে ডাক্‌ছে —কিন্তু খাঁচার পাখীটার সে লোহার শিকগুলোর প্রতি মায়া বসেছে, তাই সে আজ অবাধ স্বাধীনতার চিন্তা করতেও প্রাণভয়ে কাঁপছে, এমনই একটা জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে!

"চল" বল্‌লেই যে চলা যায় না—দ্বার মুক্ত হ'লেও যে যাওয়া যায় না—যাবে যে তার মনটা যে যেতে চায় না—বন্দীরও দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের স্মৃতি-জড়িত কারা শৃঙ্খলের প্রতি মমতা জন্মে যায়।

স্বভাব থেকে ছিন্ন করে যে বন্ধন, তাই শৃঙ্খল—কিন্তু যে বন্ধন স্বভাবের কোলে স্থিতি দেয়, সে শৃঙ্খলা যে না মানে সে উচ্ছৃঙ্খল। সমাজের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলের চির বিরোধ! সংসারের বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী সমাজ-বন্ধন নয়, সমাজবন্ধনকে "পাশ কাটিয়ে" চলে, সংসার সমাজের প্রতি মমতাহীন, সংসার-বন্ধন-মুক্তি-প্রয়াসী সন্ন্যাসী, অথবা ভোগবিলাসী—যারা চিন্তা, যত্ন, শ্রদ্ধা, মমতা দিয়ে কোনদিন সংসারের সংস্কার করলে না।

এ নবযুগে "আদর্শ পল্লী"র প্রতিষ্ঠা চাই; আদর্শ ঠিক হ'লেই পল্লী সহস্র সহস্র বনলতার মত আপনা আপনই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌বে।

ফুলগাছের প্রাণটা হওয়া চাই অফুরন্ত—টবের ফুলন্ত গাছে দখিন হাওয়া প্রাণের ঢেউ তুল্‌তে পারলেও সে ঢেউ অফুরন্ত প্রাণের অভাবে স্থায়ী হবে না! টবের গাছের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির লালসা আমাদের ভোগের লালসার সঙ্গে তুলনীয়; গাছটা যেমন যখন তখন স্থানান্তরিত হয়, আমরাও তেমনই উচ্ছৃঙ্খল, আমাদেরও স্থিতির স্থিরতা নেই; আজ স্বভাবের বন্ধনে তাকে একস্থানে বাঁধ্‌লে পরে যে সে বাঁধন তার পক্ষে শ্রেয়; তার অফুরন্ত প্রাণের শক্তিটার ফলেই যে সে বাঁধা পড়ে, এই সহজ কথাটা তাকে বুঝ্‌তেই হবে; বিজ্ঞানের বলে আমরা টবের গাছে যত বড় ফুলই সৃষ্টি করি না কেন, আমাদের সে গৌরব স্থায়ী হবে না;—গাছটার অফুরন্ত প্রাণের সম্ভার সাজিয়ে দেওয়াই আমাদের বড় কাজ—গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়াই আমাদের গোড়ার কাজ! মানুষকে অসুখী করা প্রকৃত

শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; যে শিক্ষার ফলে মানুষ অসুখী হচ্চে, মানুষের অতৃপ্তি বাড়ছে, সম্ভোগে সুখী করতে পারছে না, সে ব্যর্থ শিক্ষা ত্যাগ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। প্রতীকারের পথ নির্দ্দিষ্ট না হ'লে "তাল সাম্‌লান" দায় হবে।

আমরা দর্প করি কিসের? বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা, হাবভাব নিয়ে "ওদের মত হ'তে চাই" কেন? যে নিদ্রিত শূদ্রশক্তি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলে আক্ষেপ করছ, সে অক্ষম হয়েও আজও তোমার জাতীয়তা রক্ষা করছে, ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়িয়া আফগান জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সহিত তাহা তুলনীয় হ'তে পারে—তোমাদের হাতে সে জাতীয়তার গৌরব রক্ষার ভার থাক্‌লে এত দিনে এই সুসভ্য জাতিকে কাঙাল সাজ্‌তে হ'ত! বাংলার কৃষকের আর আনন্দ নেই, তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছে! তাকে জাগাতে এবার পল্লীর মাঠে যেতে হ'বে। বক্তিয়ার লক্ষ্মণসেনের গৌড়-সিংহাসন অধিকার করার সেই একদিন আর বৃটীশ রাজত্বের এই একদিন; কত রাষ্ট্রবিপর্য্যয় হয়ে গেল—ঘুমন্ত কৃষকের ঘুমের ঘোর কেউ ভাঙ্‌লে না! আমাদের "বাঙ্গালী" নাম নিয়ে বাঁচ্‌তে হ'লে তাদের মাঝে এবার তাদের মত হ'য়ে ফিরে যেতে হবে। পল্লীর কুটীরে বাস করতে হবে। আমরা আজ বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার গৌরবমুকুট প'রে আস্ফালন না করে দেশের ধূলা মাথায় তুলে নেব; "বাবু" আমরা, "চাষী" হতে হবে—কোন অপমান নেই, পেটের দায়ে একটুক্‌রা রুটীর জন্য বাদ্‌শা ঔরঙ্গজেবকে রাজস্থানের গিরিসঙ্কটে একদিন মণিময় মুকুট ধূলায় নামিয়ে কাঁকর চিবুতে হয়েছিল! পুরাণো সমাজের সংস্কার করতে একেবারে নূতন "আদর্শ-সমাজ" গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'ক। আমাদের জীবনের কেন্দ্রটাই বদ্‌লে দেওয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ—আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রটা পল্লী থেকে সরে সহরের মোহাবর্ত্তে পড়ে বিকল হয়েছে। বাঙালী বিজাতির সৃষ্ট সহরে দাসত্ব করে প্রতিদিন সহর-বাসেরও অযোগ্য হয়ে পড়ছে—স্বাস্থ্যে, বুদ্ধিতে, ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রকারে। আমরা আত্মশক্তিতে নির্ভর করে ছোট বড় "আদর্শ পল্লী" সৃষ্টি করতে চাই—তার মাঝে আমরা একদিন প্রতিকুটীরে স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্রে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে দেব, দরিদ্রের বাহুতে শক্তি, উদরে অন্ন, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি ভরে দেব! আমরা অক্ষম বলে সংশয় না আসে যেন, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে আমরা যে কোন বড় কাজই করতে পারব। ইংরাজ-বণিক সম্প্রদায় কলিকাতা নগরী গড়ে তুলেছে; আজ মাড়োয়াড়ী বণিকরা দেশের মাটী কিনছে, আমাদের মাটী ছাড়বার কি এই সময় হ'ল? এ যুগে

বাঙালী বলে পরিচয় দেবে যে, পল্লীর মাটীর ঘরে বাস করবার জন্য তার প্রাণ কাঁদবে। যদি সভ্যতার বিনিময়ে যশ আর অর্থই চাই ত, আমরা দুনিয়ার হাটে দুদিনেই কাঙাল হয়ে যাব।

সাদা-টবে ঢাকা সবুজ তৃণরাশি যেমন ফ্যাকাশে হয়, অমন সাদা আমরা হব না, আমরা আলো হাওয়ার মুক্ত রাজ্যে নবদূর্ব্বাদলশ্যামই থাক্‌ব।

দেশ যদি স্বচ্ছন্দে ভোগের আয়োজন চিরকাল সম্মুখে তুলে ধরতে পারত, তাহলে না হয় কোন আপত্তি ছিলনা। ভোগের জন্যই আমরা দাসত্ব করতে সহরে এসেছি; দাসত্ব মোচন হয় নি, ভোগও তো হয় নি!—পল্লীর দেবতাকে ভোগ না দিয়ে আমরা ভোগ করতে গেছি, পারি নি,—দারুণ অক্ষমতার লজ্জায় ধিকারে এ ভোগ সর্ব্বস্ব জাতির প্রাণ ভরে উঠেছে। পল্লীর কৃষককে যারা প্রাণ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে বাঁচাত, তারা আজ ভোগের লালসায় ছুটে এসেছে—ব্যর্থ শিক্ষা ও ভোগ সুখদাতার স্তুতি, আর পল্লী-সমাজের নিন্দা বেশ বিনিয়ে করতে শিখেছে! ওদিকে অবাধে আজ যারা পল্লীর "সোমনাথ-মন্দির" লুণ্ঠন করে নিচ্ছে, তাদেরই ভিক্ষান্নে আত্মরক্ষা করে বিলাসীর নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহের জন্য সবাই আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছি! রূপের মাদকতায় তৃপ্তি নেই—অর্থসামর্থের অভাবে অক্ষমতা ও অবসাদ অষ্টাঙ্গে বেষ্টন করছে—তবু এই ভোগবিলাসিতার মোহ ও দাসত্ব ঘুচ্‌ছে না; সুখকরকে ছেড়ে হিতকরকে বরণ করা হচ্চে না।

সব জড়তা, সব অবসাদ, সব আশঙ্কা একবার ঝেড়ে ফেলে "চলতেই" হবে—মাথার উপর ঝড়ঝাপটা দেখে খাঁচার মমতা করলে চলবে না। চল্‌বার আগে চল্‌বার ইচ্ছা চাই, চল্‌বার শক্তিটা চল্‌তে চল্‌তেই আস্‌বে; মুক্তি পেয়েই বেশী ছুট্‌লে অসাড় পাখা বইতে পারবে না যে, সে কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

ঐ শোন, কর্ম্মের বাঁশী বেজেছে—"বনের ফুল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে যত যত বড়ই হ'ক না তার অফুরন্ত প্রাণ মলিন হয়ে আস্‌ছে। তার সবটুকু নির্য্যাস বিদেশী লুটে নিয়ে তার সভ্যতার রুমালে ফোঁটা ফোঁটা মাখাচ্ছে। আমাদের কাজ যত বড় করেই করিনা কেন, একথা ভুললে চলবে না, সে কাজ শেষ করবার ভার "নূতনের হাতে" দিয়ে যেতে হবে—এমনই রূপ-রস-গন্ধ ভরা কত প্রস্ফুটিত ফুলের পাপ্‌ড়ি পরে ঝরে পড়বে আবার নূতন বৃন্তে নূতন সৃষ্টি বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে; কিন্তু আমাদের প্রাণটা ঐ টবে-ঘেরা সঙ্কীর্ণতার সীমার মধ্যে যদি ধরা থাকে, তবে ফুল যত বড়ই হ'ক না কেন, ফলগাছের প্রাণ

অকালে ফুরিয়ে আস্‌বে। রস যতক্ষণ থাক্‌বে—ফুল, পাতা, ডাল পালা সবই থাক্‌বে, তবে ক্রমশঃ মলিন হয়ে আস্‌বে—কিন্তু অন্ধকার মাটীর নীচে রস আহরণ করছে যে কর্ম্মী শিকড়গুলি, তারা একদিন স্বাভাবিক কারণে অসীম শক্তি সঞ্চয় করে সসীম বন্ধন ভাঙ্‌বেই ভাঙ্‌বে; সে ভাঙন রোধবার শক্তি ভগবানের সৃষ্টিতেও নেই।

বড় বড় লোকের বড় বড় কথায় কিছু কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কবি কর্ম্মী কারো কথা দেশ শুনেও শুন্‌লে না। সমাজের জড়তা ভাঙ্‌বার কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা না পেয়ে জাতির কাছে কৃতঘ্নতা বেশী পেয়েছেন। কর্ম্মীর আদর্শ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় "খাঁচার পাখী" বলেই বোধ হয় কোন "খাঁচার পাখী" তাঁর কথা কানে তুললে না, ভয় ত ভাঙল না, সাহসও হ'ল না; তিনি "বনের পাখী" হ'লে বোধ হয় নিরুপায়দের একটা উপায় হ'ত।

শেষ কথা।—আমরা শাস্ত্র মান্‌তে চাই না; অথচ "শাস্ত্র" লিখে ফেলি—আমাদের "শাস্ত্র" কেউ না মেনে তর্ক করলে আমরা ভারী চটি! আমরা যা লিখি, তা কোনদিন কেউ যেন শাস্ত্রবাক্য বলে মাথা পেতে না নেয়—হৃদয় যেটুকু গ্রহণ করবে সেইটুকু লেখাই এ লেখার সার্থকতা—মাথা পেতে নিলেই চিরকাল "বোঝাই" বইতে হবে; সত্য যেটুকু তা অন্তরের পরশ পাথরে কষে নিতে হবে। চিরকাল যে তা "সত্যই" থাক্‌বে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। স্থান কালের ব্যবধানে অনেক বড় বড় সত্যকেও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করতে হয়েছে। আজ যেখানে কেবল সাগরের নীল জল, কতকাল পরে সেখানে আবার সারি সারি দ্বীপের ছড়া ছড়া মালা কাশীর গঙ্গাপ্রবাহে প্রসাদী ফুল বিল্বপত্রের মত ভাস্‌বে!

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ।

বিশে পাগ্‌লার চিঠি।

দাদা, তোমরা ত জান আমি শাস্ত্র-পড়া ছেঁদো কথা মোটেই কইতে পারিনে। সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের চুল-চেরা বিতর্ক আর পুরাণতন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি বা সাধনের তত্ত্বপ্রসঙ্গ, এতে আর কালক্ষেপ করতে মোটেই

রুচি হয় না। তবু এ হতভাগাকে আবার কাগজে লেখবার জন্যে পীড়াপীড়ি কেন? তোমরা কি জান না যে লোকে সত্যি কথাটা সোজা করে চলতি ভাষায় শুনতে বড়ই নারাজ। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দের হেঁয়ালী রচনা করলে তবে তা' বেশ শ্রুতিমধুর হয়। * * *

কেমন করে ভগবান এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন বা স্বয়ং এই বিশ্বসংসার-রূপে সৃষ্ট হয়েছেন তা বোঝাবার জন্যে এত বুদ্ধি খরচ নাই বা করা গেল? দর্শনকারেরা যুক্তিপ্রমাণের লাঠির উপর ভর দিয়ে ফি-হাত নানাভঙ্গীতে somersault খেতে খেতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী দামী জিনিস এতটুকু ভাগবত-প্রেরণাযুক্ত সরল প্রাণের সহজ বিশ্বাস। পণ্ডিতের পাহাড়-প্রমাণ শুষ্ক শাস্ত্র-জ্ঞানের চেয়ে মূর্খের এতটুকু রসাল বিশ্বাস লক্ষগুণে বেশী ভারি। সাংখ্যকার ষাট হাজার বছর তপস্যা করে যে দর্শন লাভ করেছিলেন তার ভিতর হাজার সত্যি কথা থাক,—যদি দর্শন না থাকে, অনুভূতি না থাকে—তবে তাতে তোমার আমার কি আসে যায়? বৌদ্ধ মায়াবাদ বা শূন্যবাদকে খণ্ডন করবার জন্যে শঙ্করাচার্য্যকে বাধ্য হয়ে ঐ বৌদ্ধ মায়াবাদীরই ভাব ও যুক্তির ভাষাকে অবলম্বন করে যে সব জটিল যুক্তিজালের অবতারণা করতে হ'য়েছিল, তা' শুনে আজকার যুগে তোমার বিশেষ লাভ হবে না। আমার প্রাণের ভিতরের বিরাট পুরুষকে ছেড়ে, আমার বুকের ঠাকুরের পাগল-করা বাঁশীর ডাক না শুনে কি জন্যে কেতাবী যুক্তিতর্কের ঘর্ঘর শব্দে সাধ করে কান ঝালাপালা করতে যাব? সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ আর শঙ্করের মায়াবিজড়িত একপুরুষবাদ যখন প্রচারিত হ'য়েছিল, তারপর যে এতটা কাল কেটে গেল তা বৃথা কাটেনি। ঐ দর্শনগুলোর যুগের পর থেকে জগন্নাথের সৃষ্টিচক্রের রথের চাকাগুলো ক্লান্ত হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথবা শঙ্করের তিরোভাবের পর পিছন দিকে হটে গিয়েছে, এমনতর একটা ধারণা করবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিনে। সে চাকার গতি চিরদিনই অবাধ, আর চিরদিনই সামনের দিকে। একদল সুপণ্ডিত লোকে কিন্তু প্রাচীনের প্রতি বেজায় অনুরক্ত হ'য়ে নবীনকে অবজ্ঞা করে আসছেন। তাঁদের হাতে একটা করে দূরবীণ আছে। যখন ভারত-গৌরবের দিকে তাঁরা দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, তখন সেই দূরবীণের সোজা দিকটা দিয়ে দেখেন, আর সব বড় বড় দেখতে পান; আর হাতের গোড়ায় নবীনের দিকে যখন তাকান, তখন তাঁরা ঐ দূরবীণটা ঘুরিয়ে উল্টো করে নেন—তাই নিকটের জিনিষগুলো হাজার বড় হ'লেও ছোট দেখায়।

আবার সত্যযুগ আসছে এ কথা বল্লে, সেই প্রাচীনকালের সত্যযুগটি অথবা সেই রকম একটা কিছু কালচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসছে, এমনতর একটা আশঙ্কা করবার কোনই কারণ নেই। সেই সেকালের সত্য-যুগটি যতই কেন আমাদের গৌরবের সামগ্রী হোক না, সেই যুগে মানুষের জীবন যতই কেন সুন্দর হোক না, আমরা সে যুগের যতটুকু জানি, তাতে সেই সত্যযুগকে মানুষের চিরন্তন আদর্শ যুগ বলে মেনে নিতে পারি না। সেই আদর্শ অনুসারে খুব বড় বড় করে গ্রামে গ্রামে নিত্য দু'চার মণ ঘি জ্বালিয়ে আমরা পুরাতনের প্রতি সমাদর দেখাতে পারবো না; অথবা দেদার গরু-ঘোড়া কেটে তাদের রক্তে দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করতেও প্রস্তুত নই। নদনদীর তীরে গৌরকান্তি মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘনাসা আর্য্যগণ সামগানে ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলতেন—এই কথা শুনেই আমরা আবার নদীর তীরে তীরে বেদমন্ত্র আওড়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে মোটেই রাজি নই; অথবা তাঁদের সমাজে নিয়োগপ্রথা বা ঐ ধরণের যে সব প্রথা ছিল, আজ এই এমন দিনেও সেই সকল প্রথাগুলোকে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সত্যযুগের প্রথা বলে খাতির করে আমাদের সমাজের মধ্যে চালিয়ে দিতেও পারবো না। মোট কথা অনুকরণ কারুরই করবনা—তা' সাহেবদেরও না, আর আমাদের অতি-গৌরবের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদেরও না। অনুকরণ মানেই আত্মহত্যা। সাহেবদের অনুকরণ করে মরতে বসেছি, অতএব সে ভুল না করে, এস আমরা সেকালের পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুকরণ করি, এমনতর একটা কথার নির্ব্বিচারে অনুসরণ করলে মস্ত একটা ভুল করা হবে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে—সাহেবরাও মানুষ, আর আমরাও মানুষ। আমরা যদি মানুষ না হতেম, তা হ'লে না হয় একটা নূতন বা পুরাতন মানুষের দলের অনুকরণ করে মানুষের মত একটা অভিনয় করবার চেষ্টা করা যেত! আমরাও যখন মানুষ, কারুর অনুকরণ করে আমাদের প্রাণ আমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে তাও নয়, কারুর দেখাদেখি আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি না; মনোবুদ্ধ্যাদি পঞ্চকোষের এক আধটা আমাদের কম আছে তাও নয়, তবে কি কারণে আমরা নিজেদের অবাধ চিন্তাপথকে রুদ্ধ করে, নিজেদের প্রাণশক্তিকে, স্বাধীন জীবনগতিকে ব্যাহত করে, ফ্যাশানের খাতিরে অনুকরণ করতে গিয়ে সং সাজ্‌তে যাব? * * *

আমরা সেকালের সত্যযুগকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করবো, সেই যুগের ঋষিদের হৃদয়ের পূজা দেব, তাঁদের গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবো—

এসব হ'লো স্বতন্ত্র কথা ; আর তাঁদের যাগযজ্ঞ, সাধন পদ্ধতি, রীতিনীতির বোঝা মাথায় করে জীবনটা দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত এবং বা তাঁদের শাস্ত্রস্তূপের পুঙ্খ পুঙ্খ বিধি নিষেধের কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া, এ হ'লো স্বতন্ত্র জ্ঞান কথা। * * * যে সত্য যে ভাবে তাঁরা পেয়েছিলেন, সেই সত্যের উপর দাবী করে চিরকাল পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ব্বিবাদে তাই ভোগদখল করতে থাকবো, এত বড় একটা ফাঁকি প্রকৃতির আদালতে একান্ত অগ্রাহ্য।

পুরাতনের পূজা করবো, পুরাতনকে শ্রদ্ধা করবো সে বিষয়ে দুটো মত কোথাও নেই, থাকা উচিতও নয়। * * * কিন্তু তাই বলে তাঁদের জীবন-যাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলি, তাঁদের আচার-ব্যবহার, তাঁদের আশা-ভরসা যাই নকল করতে যাব, অমনি আমাদের প্রাণের ভিতরের স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ম্প্রকাশ দেবতাটির অপমান করা হবে। মানুষের প্রাণের যিনি প্রাণ, মনের যিনি মন, তাঁর ভাণ্ডার যে অফুরন্ত আর অনন্ত বিচিত্রতাময়। নিত্য নূতন নূতন রসের প্রকাশ করে এই বিরাট সৌন্দর্য্যের হাটে নিত্য এমনি নূতন আর বিচিত্র শোভার বিকাশ করছেন যে এই আনন্দের লীলার ভিতর এতটুকু এক ঘেয়ে ভাব প্রবেশ করতে পারছে না। তাই বলি ভাই, একটা নূতন কিছু দেখলেই শিউরে উঠে এ বিচিত্র খেলার যে আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হ'য়ো না। আমার যে হৃদয়স্বামী সে যে চির নূতন—তাই তাঁকে পেয়েও পাওয়া হয় না। আর তাঁকে পাওয়া না পাওয়া যে মোটেই আমাদের হাতে নয়কো। তিনি যখন কৃপা করে ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কাছে যতটুকু যে ভাবে প্রকাশিত হন, মানুষ তাঁকে ততটুকুই জানতে পারে। তিনি হনুমানের কাছে যে ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিলেন, লক্ষ্মণ বা বিভীষণের কাছে সে ভাবে হন নি। আবার এদের সকলের কাছে যে রূপে আর যে ঐশ্বর্য্যে ব্যক্ত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে গোপীদের কাছে প্রকটিত রূপৈশ্বর্য্যের কতই পার্থক্য। একই মূর্ত্তি, শ্রীদাম-সুদাম দেখেছিল একভাবে, আর পঞ্চপাণ্ডব দেখেছিল আর এক ভাবে। এইরূপ প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রকাশিত তাঁর লীলার মধ্যে একটা স্পষ্ট বিশিষ্টতা আছে ;—একই সাধকের মনোমধ্যে নিত্য নূতন খেলা হিসাবে নিত্য নূতন বিচিত্র রসতরঙ্গের আবির্ভাব। যেমন ব্যষ্টির সাধনায় তিনি নিত্য নূতন তরঙ্গ তুলে সাধককে আনন্দের পুলক থেকে পুলকান্তরে নিয়ে যান, তেমনি আবার সমষ্টির কাছেও—সমাজ বিশেষ ও জাতিবিশেষ এবং বিশ্বমানবের কাছেও—যুগভেদে তাঁর অভিব্যক্তির রকম আলাদা আলাদা। মানুষ যে ভাবে যতটুকু নিজ অন্তরকে

বিকশিত উন্মুক্ত ক'রেছে, অন্তরদেবতা ঠিক সেইভাবে ততটুকুই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।

দাদা, সবাইকে খুব হাঁক-ডাক ক'রে বল যে আজিকার মানুষের চেয়ে ভাগ্যবান্ মানুষ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেনি। আমার বলবার ধরণ-ধারণে বিদ্যাবুদ্ধির সংস্রব নেই, তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ যে আগে তোমরা এই কথাটা মানুষকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল, যে সৃষ্টি-ব্যাপারটা ক্রমবিকাশশীল ; কাল যত অগ্রসর হচ্ছে, সৃষ্টির মধ্যে ভগবল্লীলার ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য ততই অধিক পরিমাণে প্রকটিত হ'চ্ছে। আরও বল, যে ঋষিরা কোনও একটা অতীত যুগবিশেষে অকস্মাৎ পথ হারিয়ে ধরায় এসে পড়েন নি, সকল যুগেই তাঁরা এসেছেন, আর বর্ত্তমান যুগের ঋষিরা যারা এসেছেন বা আস্‌বেন, তাঁরা পূর্ব্বগত ঋষিদের চেয়ে ঢের বেশী ভাগ্যবান্। চিন্তা কি ? দশবার ব'ল্লে যদি না বোঝে, শতবার বল। যতক্ষণ না বোঝে, ততক্ষণ প্রেমপূরিত আকুলহৃদয় নিয়ে সকলের পায়ে ধ'রে ধ'রে বল, যে এই পূর্ণলীলার যুগে মানুষ অতি অল্প আয়াসেই ঋষিত্ব লাভের অধিকারী। —সৎসঙ্গী (আশ্বিন)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল,]

শাস্ত্র বলেছেন, বৈরাগ্যমেবাভয়ং— আমিও সেই অভয়কে বুকে নিয়ে সারাসংসার ঘুরে বেড়ালাম এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভয়কে আর খুঁজেই পেলাম না। কোথায় হে ভয়ানাং ভয়ং; কোথায় তুমি ভীষণং ভীষণানাং ? তোমায় যে খুঁজেই পাই না প্রভু! পুরাণে পড়েছিলাম এক দৈত্য নারায়ণকে দুঘা দেবার জন্য সারাসংসার তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল। ঠাকুর কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে সেই দৈত্যের বুকের মধ্যেই চুপ চাপ ঢুকে বসে ছিলেন। দৈত্য বেচারী সারাসংসার খুঁজে তাঁকে আর না পেয়ে শেষে যাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে বসেছে অমনি তার বুক থেকে বেরিয়ে ঠাকুর সাগরতলে গিয়ে লুকুলেন! আমারও তাই হয়েছে নাকি ? তাহলে ত' চুপ করে বসা হবে না, বসলেই ত' সে বুক থেকে বেরিয়ে লম্বা দেবে।

আমি এই রকম একটা তর্কই বোধ হয় অজ্ঞানে করে ফেলেছিলাম, এবং সেই সিদ্ধান্তই এখনো আমার পেয়ে বসে রয়েছে।

যাই হোক চলন্ত মন্দিরে অচল ঠাকুরকে অজ্ঞাতে বহন করে, আমি যেবার কেদার বদরি নারায়ণ পথে চলছিলাম তারই কথা বলব। পাহাড়ের পথে চলার আনন্দে আমার ভয়ঙ্কর ঠাকুর অভয় মূর্ত্তিতে পদে পদে ধরা দিচ্ছিলেন তবু ধরতে পারিনি। অরূপ ঠাকুর বহুরূপে আমায় ধরা দিচ্ছিলেন তবু দেখতে পাইনি। তবু বাইরের না-ধরাটাকে অন্তরের ধরা বলে ধরে নিতে, বাইরের না-দেখাটাকে অন্তরের দেখা বলে ধরে নিতে আমার অন্তরের অন্তর এক মুহূর্ত্তও বোধ হয় ভুল করেনি। কিন্তু এমনি আমার পাগলপ্রাণ, এমনি আমার বৈরাগী মন যে সব পাওয়াকে ত্যাগ করে ছুটেই চলেছিল। বন্ধুর পথে ক্লেশের পথে ভয়ের সেই পরম বন্ধুকে ক্রমাগত পেয়েও আমার মনটা যে কিছুতেই তাঁকে পাওয়া বলে স্বীকার করেনি, এখনও যে সেই চির-অপাওয়াই রয়েই গিয়াছে! যাক—যাক—তাই হোক!

কিন্তু আমিও ত' ছাড়ছিনে। সাত রাজার ধন পেতেই হবে, নইলে কি মরব নাকি? কিছুতেই মরা হবে না আমি অমৃতের ছেলে যে, মরব কি করে? ও কথা যাক—

এইবার যার কথা লিখিব সেই আমার সন্ন্যাস-জীবন-আকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য। কিন্তু দুদিনের জন্য সেই আলোর সাহচর্য্য পেয়েছিলাম; তবু তাকে আমার সইল না। তার উজ্জল আলোককে মায়ার ছায়ায় কোমল করে নিতে গিয়ে তাকে হারাতে বাধ্য হইছি। সে আমার জীবনের দিকচক্রবালের তলে নেমে গিয়েছে, আর কি উঠবে, আর কি দেখা হবে!

তার সঙ্গে দেখাটাও এক অদ্ভুত রকমে হয়েছিল। ভিক্ষা করে ফিরবার মুখে একটী অতিথিও জুটিয়ে এনেছিলাম—একটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত বালক।

আমি আমার ভোজ্য প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করিছি, বালকও ক্ষুধাতুর নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করছে, আমি কেবল আমার শাঁখটায় একটা দীর্ঘ ফুৎকার দিয়ে নামিয়ে রেখেছি, এমন সময় পার্শ্বে চেয়ে দেখি জটাজুটসমাযুক্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি,—আমার নিবেদিত আহার্য্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়াইয়ে আছেন। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমার ত্যক্ত আসনে উপবেশন করে ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু বলে আহার করতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষুধাতুর বালকটীর কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম, হয়তো মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্যনারায়ণও থমকে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত

মানুষটীর অদ্ভুতকার্য্য দেখছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকে দৃষ্টি না করে ভোজন পাত্রটী নিঃশেষে শেষ করে আচমন করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মৃদু হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ওঁ তৃপ্তোস্মি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

* * *

চাওয়া নেই, চিন্তা নেই, অমনি এসে যা' সুমুখে পেলে তাই খেয়ে চলে গেল? সত্যতার ধার ধারে না, নিয়মের ধার ধারে না, না বলে না কয়ে পরের জিনিষকে আপনার করে নিয়ে ব্যবহার করলে! দয়া ধর্ম্ম নেই, কোনো বন্ধন নেই, অথচ এমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যে হঠাৎ বারণও করা গেল না।

* * *

পাহাড়ের সংকীর্ণ আর পিছল রাস্তায় আমি কোনো দিকে না চেয়ে চলছিলাম, এমন সময় দূর হতে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। আমিও দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখলাম হাত দশ বারো নীচে একটী স্ত্রীলোক অতিকষ্টে একটা পাহাড়ে লতা ধরে ঝুলছে, হয় ত আর একটু হলেই সে পড়ে যাবে। আমি আরও চমকে দেখলাম সেই আমার অদ্ভুত সন্ন্যাসীটীও হাসি হাসি মুখে সেই দিকে চেয়ে আছে। কেউ কোনো রকম সাহায্য করছে না। আমি আর কোনো কথা না বলে আমার প্রকাণ্ড মুরাঠাটা খুলে ফেলে এক জনকে বল্লাম "এটা ধর, আমি নেমে গিয়ে ওকে উঠিয়ে আনছি।" ষণ্ডা ষণ্ডা মানুষ-গুলো আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারা বোধ হয় এত বড় দুঃসাহস করতে কাউকে কখন দেখে নি। বিশেষতঃ দুটো মানুষকে ধরে রাখার শক্তি কারু ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ পিছল আর সঁকীর্ণ পথে পা বাধাবার মত কিছুই ছিল না। কেউ যখন ঐটুকু মাত্র সাহায্য আমার করলে না, এমন কি আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল, তখন আমি ঐ অদ্ভুৎ মানুষটীর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ বল্লেন—মায়া মায়া!

মায়া! হোক মায়া, আমি আর থাকতে পারলাম না, তার হাতে আমার মুরাঠার একটা দিক ছুড়ে দিলাম। সেও যেন কলের পুতুলের মত সেটা চেপে ধরলে! কিন্তু কি তার শক্তি! একটু হেল্‌লেও না, অনায়াসে দুটো মানুষকে টেনে ওপরে তুলে ফেলে ধোঁৎ ধোঁৎ করে চলতে আরম্ভ করলে! আমিও সঙ্গ নিলাম।

* * * *

মাঝে মাঝে যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে যাত্রীদের সাহায্য না করা কি ভাল

হচ্চে, সে কেবলি হেসে বলেছে, "পাপের বন্ধন যদি বন্ধন হয়, পুণ্যের বন্ধন কি বন্ধন নয়? মায়া—মায়া—মায়া! আবার মায়ার বশবর্ত্তী হব কেন?"

মায়া! জীব রূপে শিব নিজে হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছেন, সাহায্য চাচ্চেন, আর আমি বলব মায়া—ভেলকি—মিথ্যে! ঐ যে মেয়েটী ছেলে কোলে করে পথ চলতে পথের ধারে বসে পড়ল, তার দু' বছরের ছেলেটা পথের ধারে ওলাউঠায় মারা গেল, কেউ তার দিকে চাইলে না এইটেই কি মায়া কাটানর পথ? তবে যারা এই দুর্গম পথ সুগম করবার জন্য মাঝে চটী করে রেখেছেন, ধর্ম্মশালা করে রেখেছেন, তাঁরাও ত মায়ারই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

* * * *

কিন্তু তখন যে মায়া কাটাতেই বেরিয়েছিলাম। কত সময় পাহাড়ের ধারে বসে হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভায় মগ্ন হয়ে গিয়েছি, দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের উপর সূর্য্য রশ্মির খেলা দেখতে দেখতে পথ হাঁটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মনোরম প্রদেশের শোভায় গাম্ভীর্য্যে আপনাকে হারিয়ে শুধু বাহিরটার মধ্যেই ডুবে গিয়েছি, তবু সেই পথের বন্ধুটী আমায় ত্যাগ করেন নি। সে বাহিরের সব মায়া ত্যাগ করেছিল, কিন্তু এই কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুটীর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। কেন তা' জানিনে, তবু সে আমায় ভাই বলে স্বীকার করেছিল, আমিও তাকে দাদা বলে, বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, বুঝি খুব ভালও বেসেছিলাম। কিন্তু সংসার ছেড়েও, যার জন্য সংসার, সেই ভালবাসাকেই সত্য বলে স্বীকার করে ফেলেছি, মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারি নি, এটা কিন্তু তখন সাহস করে স্বীকার করতে পারি নি।

* * * *

কেদারে পৌঁছে, সকলেই যেমন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, আমরা দুজনেও প্রায় তেমনি করেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি অন্ততঃ তখন মনে মনে বলেছিলাম, "পেলাম, ওগো পেলাম, তোমায় পেলাম।"

বন্ধু আমার অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য, তার নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করলে না। তারও বৈরাগ্যের অনুরাগ তার গোপন প্রাণের চিরন্তন ভুল গুলিকে একেবারে গলা টিপে মারতে পারেনি। সেও যেন চোখের জল দিয়ে স্বীকার করলে, যে, ভুলের ওপরই যেন জগতের যত সৌন্দর্য্য যত রস যত আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। ঐ শিলাময় বিগ্রহের কঠিনত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, সসীমত্বের মধ্য দিয়ে একটা

অন্ততঃ অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া গেল। যেন কে আমায় বলে দিলে যে যাকে ছোট মনে করছ তারই মধ্যে দিয়ে যদি বড়কে দেখতে পাও, তা'হলে আর ভয় কি—ভয় কোথাও নেই, কোথাও থাকতেই পারে না। ভয়টাই মায়া, মিথ্যা—যেখানে যাও সেইখানেই এই ভয়ের মধ্যে অভয়কে দেখতে পেতে পার। যা' তোমায় বাধা দিচ্ছে, যাকে নিতান্তই ছোট বলে, সসীম বলে অবজ্ঞা করছ, সেই ছোট্ট নিতান্তই হাতের মধ্যেকার কঠিন পাথরটুকুই তোমার অসীমের মধ্যে প্রবেশের দরজা। প্রত্যেক বড় বস্তুই অ-জড়ের মধ্যে দৃষ্টিপ্রবেশের গবাক্ষ।

সেই ছোট্ট পাথরটুকুকে ছুঁয়েই "আমি নগাধিরাজ" দেবতাত্মা হিমালয়ের স্পর্শ পেলাম। আমি অভয়কে পেলাম, সুন্দরকে পেলাম, আনন্দকে পেলাম।

* * * *

হতভাগা দেহটা বন্ধুরই অনুসরণ করলে এবং কিছুদিনের মধ্যেই কণখলে ফিরে এসে আমার বন্ধুর গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হল। তারপর এই পথে বেরিয়ে সবাইকে যা' করতে হয় তার সমস্তই আমায় করতে হল। শম, যম, দম, নিয়মের সমস্তই পালন করলাম, নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই শেষ করলাম। তারপর ছ-মাস ধরে একটা ছোট ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে তুল্লাম, যে, নিজেই নিজেকে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আহার সংযম করতে করতে প্রায় অনাহারে গিয়ে ঠেকেছিল। তারপর ক্রমশঃ সেটাকে বাড়াতে বাড়াতে যখন স্বাভাবিক আহারে এসে পৌঁছলাম, তখন আমার শরীর যেন একটা কিসের তেজে অন্তর-বাহিরে জ্বলতে আরম্ভ করেছিল। একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্বে মিলুতে মিলুতে—সংসারটা যে ভুয়ো এবং আমি যে প্রায় সেই ভুয়োর সামিল, একটা অস্তিত্বমাত্র, এই জ্ঞানটা আগুনের অক্ষরে নিজের ওপর লিখে ফেলেছিলাম। বন্ধুই কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে পেত, আর কেউ নয়। কিন্তু এমনি করে সংসারটা মিছে করে তুলেও সেটার যখন কিছুতেই অন্ধকার মরল না, তখন গুরু আমায় নবরাত্রি করালেন—৯ দিনের জন্য একটা ঘরের মধ্যে একদম একলা বন্ধ করে রাখলেন। সেই নয় দিনের পর আমি হোম শেষ করে যখন বাহিরে বেরিয়ে এলাম তখন আমার শরীরটাও যেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সারা সংসারও যেন তেমনি প্রাণহীন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাঃ! তোমার মুখ দেখেই বুঝতে

পারছি তুমি লব্ধকাম হয়েছ। আজ জোর করে বলতে পারি, তোমার পূর্ণ সন্ন্যাস হয়েছে, আজ তোমার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'—তোমার জন্মও সার্থক।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না—কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর হতে কে যেন বল্লে—'আর পারিনে'। আমি ফিরে দূরে যেখানে হিমগিরি তুষারের আভাসে চকমক করছিল, সেদিকে চেয়ে রইলাম। কি যে সারা সংসার আমার কাণে বলছিল তা মনে নেই, সমস্তই যেন ছায়া ছায়া! ছায়া ছায়া ছায়া ছায়া—সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই, আমি আছি কিনা যেন তারও ঠিক নাই।

তাই বলে এটাও সত্য নয় যে এই কৃচ্ছের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্যে কোনো সুখ পাইনি। এমন একটা ভয়ানক মাদকতা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করিনি। এই যে চব্বিশটা তত্ত্বকে নিয়ে রাতদিন খেলা করা, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মানুভূতি আত্মকর্তৃত্বানুভবের সুখে আমায় মাতাল করে তুলেছিল। আমিই একমাত্র 'অচলং ধ্রুবং', বাদবাকী সমস্তই চঞ্চল ও পরিণামী।

কিন্তু সেই সুখ যে কতখানি, তার অনুভূতি নিজে না করলে কিছুতেই বোঝাবার জো নেই। অথচ নিজবোধগম্য সেই রসে আমার চিত্ত যেমন এক দিকে সরস হয়ে উঠেছিল তেমনি আর একদিকে সে যে প্রচণ্ড শুষ্কতা অনুভব করছিল, এ কথা প্রথম প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে বুঝতে পারিনি। ক্রমশঃ মনের একটা দিক যতই আত্মবশ হয়ে "ন কিঞ্চিদপি" চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠছিল, আর একটা দিক তেমনি একটা ভীষণ একত্বের শুষ্কতায় পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করেছিল। একদিক দিয়ে যেমন প্রচণ্ড সুখকে অনুভব করেছিলাম আর একদিক দিয়ে তেমনি সজোরে আমার সেই চিরকালকার আশার বস্তুর সঙ্গে—দুঃখের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে পীঠাপীঠি ভাবে আপনাকে অনুভব করেছিলাম। অথচ সে কথাটা ধরতে পারিনি; বুঝতে পারিনি কিসের অভাব? কার অভাব? আমি যখন সমস্ত বহুত্বকে অখণ্ড একত্বে পরিণত করছিলাম তখন কিসের চিরন্তন ক্রন্দন আমার পিছনে লেগেই ছিল? সেই মহাসুখের পেছনে যে দুঃখ বিপরীত মুখে বসেছিল সে কে গো? তাকে ত কেউ দেখিয়ে দিলে না?

* * *

যিনি পরম এক, তিনিই হয়ত নিজের একত্বের মধ্যে বহুত্বকে অনুভব করতে না পেরে আমারই মধ্য দিয়ে বহুত্বকে অনুভব করেছেন।

গুরু আশীর্ব্বাদ করলেন। আমিও তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বন্ধুর

কাছেও বিদায় নিলাম। বন্ধুকে বল্লাম, যে, যদি এ তত্ত্বের মীমাংসা করতে পারি তা' হলে নিশ্চয়ই তাকে সে তত্ত্ব বোঝাব। সেও হেসে বল্লে—"মায়া—মায়া—অনাদি মিথ্যা—তোমার দেখছি এ মায়ার হাত হতে নিস্তার নেই।"

আমি উদাস ভাবে বল্লাম "হয়তো নেই—হয়তো কারুরই নেই। তোমারও নেই, আমারও নেই, হয়তো গুরুদেবেরও নেই।"

বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"আমিও বেঁচে থাকব, আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই হবে। তখন কি বল শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।"

উপাসনা—ভাদ্র, ১৩২৭।

অরবিন্দের ভাবকণা।

জীব ও শিব।

প্রকৃতির কোলে নেমে আসবার ভগবানের এই যে আকুলি ব্যাকুলি, তা' ঘুচবার নয়; মানুষেরও ভগবানের স্বারূপ্য লাভের এই যে ঊর্দ্ধগতি, তাও মুছবে কেঁ? সসীম ও অসীমের এই ত চিরদিনের সম্বন্ধ। যখন দেখে মনে হয় এ উহার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেছে, তখনও বুঝবে সে অভিমান নিবিড়তর মিলনের সূচনা মাত্র।

মানুষের মধ্যে জগৎ-প্রকৃতি আপনার বিষয়ে সচেতন হয়, সে কেবল নিজের জীবন মধুপের দিকে উন্মুখ হয়ে ফুটবার জন্য। এই জগত-প্রকৃতি আপন উপভোক্তার সহিত অজ্ঞানে মিলনে আছে, এ দশায় তাহার জীবন ও চেতনা নিত্য-মিলনের সে ধন হতে মুখ ফিরিয়ে' থাকে, আবার তাহার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকেই চায়। জীব-প্রকৃতি ভগবানকে জানে না, কারণ সে যে আপন স্বরূপ দেখে নাই। যখন সে আপনাকে চিনবে তখন সে অবিমিশ্র অকৃত্রিম অস্তির আনন্দে ভরে উঠবে।

একের মধ্যে হারান নয়, কিন্তু একের মধ্যে পাওয়াই এ লীলার কৌশল। জীব ও শিব, জগৎ ও জগদতীত তখনই এক হয়, যখন দু'জনে চোখোচোখী হয় —এ উহাকে জানে। দু'জনার ভেদই অজ্ঞানের কারণ, এই অজ্ঞানই বেদনা।

মানুষ অন্ধের মত খোঁজে, এমন কি সে যে তার পরম সত্তাকে খুঁজছে তাও

সে জানে না, কারণ সে যে জড়-প্রকৃতির অন্ধকারে এ যাত্রা আরম্ভ করেছে। যখন সে ক্রমশঃ দেখতে আরম্ভ করে, তখনও অবধি জীবনের এই যে অন্তর-আলোক ক্রমশঃ জাগছে—বাড়ছে, তার জ্যোতিতে তার দু'নয়ন বহুক্ষণ ধাঁধিয়ে অন্ধ থাকে। ভগবান—তাহার সেই অন্তরদেবতা ও প্রথম প্রথম সে খোঁজার সাড়া ধীরে ধীরে দেন। কোলের শিশু যখন হাতড়ে হাতড়ে মাকে খোঁজে, সে অন্ধ প্রেমের স্পর্শ মা যেমন সম্ভোগ করে, ভগবানও তেমনি জীবের এ অজ্ঞান চাহেন, সে অজ্ঞানের মাধুর্য্য সম্ভোগ করেন।

প্রকৃতি ও ভগবান খেলার মত্ত—এ উহার প্রেমে বাঁধা দুইটি বালক বালিকা। দু'জনে দু'জনের দেখা পেলেই তারা দৌড়ে লুকায়, দু'জনে দু'জনের চোখের অন্তরাল হয়, কারণ তার পরই ত প্রেমের জনকে আবার খোঁজার, আবার পিছু নেওয়ার, আবার ধরে ফেলার সুখ আছে।

সেই শিব জীব হয়ে প্রকৃতির কাছে লুকিয়ে আছেন; দ্বন্দ্বে, চেষ্টায়, বল-প্রয়োগে অনিশ্চয়তার সুখে প্রকৃতি-বধূকে অধিকার করবার জন্যে মানুষ হয়ে তার এ আত্মগোপন। সর্ব্বাতীত বিশ্বময় মানুষই ত ভগবান, সে আপনার পরম সত্তার কাছ থেকে মানুষের কাঠামোর মধ্যে লুকিয়েছে।

লোমশ দেহে চতুষ্পদের ওপর পশু হয়ে মানুষেরই ছদ্মবেশ। কীটু সেও মানুষ—কিলবিল করে গুড়ি গুড়ি যাচ্ছে তার মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের দিকে। কীটের থেকেও আরও জড় বস্তু—সবই মানুষের অপরিণত তনু। নিখিল চরাচর সবই যে মানুষ—সেই পরম পুরুষ।

মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি?—যাকে কেহ কখন গড়ে নাই, যার বিনাশ নাই, সেই আত্ম-ধন আপনার উপাদানে মন ও দেহ গড়ে আপনি রূপ নিয়েছে।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

মন্দির।

"মন্দির" কবি কিরণচাঁদ দরবেশের কবিতাগ্রন্থ, মূল্য ১৷৷০ টাকা। আমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি আর তাহার পর মিলন, এই যে আত্ম-নিকুঞ্জে অভিসারের পথটুকু, ইহার বর্ণনা কত অভিসারিকা কত ভাবে কত রূপকে দিয়াছে।

মন্দিরেও আমার দরবেশ দাদা তাঁর কুঞ্জ-পথ-কথা তাঁহার মনের মত করিয়া দিতে গিয়া মন্দির লিখিয়াছেন। শিশু একা থাকিলে আপনার রাঙ্গা রাঙ্গা ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা লইয়া খেলা করে, জগৎ-শিশুর আপনাকে লইয়া তেমনি এই খেলা। সে আপনি বঁধুয়া, আপনি দয়িত, আপনি মিলন। ভেদ রচিয়া রচিয়া আপনাকে তাহার এই অফুরন্ত করিয়া আস্বাদন। সে যা' করে, আনন্দের স্রষ্টা ভক্তও তাই করে। এই দরবেশ-কবি তাই মন্দির-পথবর্ত্তী হইয়া তাহার ধাপ রচিয়া রচিয়া আপন রাস-কথা মধুময়ী করিয়া বলিতে পাগল। কারণ এখানে বলাই যে চলা, চলাই যে পূজা, পূজাই ত পাওয়া—সব তুঁহু তুঁহু।

আগে বাহির, তার পরে অন্তর, সব শেষে মিলনের নিবিড়তা। তাই কবিতাগুলি জ্বালা বেদনা বিরহ বহিয়া বহিয়া পাপ বন্ধন অশ্রুর ভয়ে রহিয়া রহিয়া ক্রমশঃ নিবিড় মিলনে মধুর হইয়াছে। মন্দিরের শেষাংশ তাই বড় মধুমাখা—"মধু হতে মধুতর কি এক তু!" দরবেশ কবির বেদনার কথা শুন:—

"বুলাইয়া দাও তপ্ত এ বুকে
সকল রঙের তুলি।"

দেখ সে-রস-রসিকের কান্নাও কি মিষ্ট! মিষ্ট ত হইবেই, কারণ তখন হইতেই ত সাধকের প্রাণ দয়িতের অঙ্গগন্ধে পাগল:—

কেন "সকলের সুরে তোমার বীণাটি রচিছে মোহন মায়া।"

* * * *

"বহু বিলসিত একের মাঝারে
একেলা তুমি হে সাঁই!"

তবুও তখন পাই কি না পাই ভয়ের মাঝে বড় সুখের বেদনা বাজিতেছে,—সংশয়-দোলা মিলনের কবিকে ব্যাকুল করিয়াছে,—

"বল গো পাগল করা কোথায় তুমি,
কবে গো পড়ব ধরা চরণ-চুমি।
গাহ গো গাহ গাহ হিয়ার দোলে
লহ গো লহ লহ শীতল কোলে।

* * *

"কার এ বীণার সুর,
প্রাণ করে ভরপুর,
টুটে বন্ধনের গ্রন্থি, মিটে যায় চাওয়া।"

ইহাকেই বলে "হারায়েছি পেয়েছি বা আজও বুঝি নাই!" তাহার পর মিলনের বাহু-বন্ধনে গিয়াও এই ভয় বিড়ম্বনার কথা সাধকের মনে হইতেছে—

এত দিন ভয়ে ভয়ে
দিনগুলি গেছে বয়ে
তব সনে এ মিলন হয় কি না হয়।

তার পরই নিবিড় প্রেমের কান্ত-ময় নিবিড়তা! তুমি-মাখা সে দেশে "আমিত্ব নাশ" আর কবির ভাল লাগে না,—

আমি ভাবি বঁধু যেথা নাই আমি
সে দেশে কেমনে থাকিবে হে তুমি?
তুমি আমি এক মালার গাঁথুনী,
আছি এক সাথে দুলিতে।

যাহাকে দয়িত-সমর্পিত—Consecrated জীবন বলে, তাহার কত অনির্ব্বচনীয় মাধুরী যে মন্দিরে আছে, তাহা আর কি বলিব। প্রেমের মধ্য দিয়া দরবেশ-কবি নবযুগের সমর্পণ যোগে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে এমন কি এ জড় দেহটিও প্রিয়ের লীলা-সুখ লাগি—

ওগো মোর প্রিয়তম!
তোমার সুখের সায়র হইয়া
ধন্য জীবন মম।
আমার অমল তনু-তরঙ্গে,
রসময় তুমি খেলিছ রঙ্গে,
আমি বিনে আর কে আছে তোমার
মধু হতে মধুরিম?

তব আহ্লাদে আমি গো হ্লাদিনী,
সন্ধিনী তব কাজে,
তোমার বিপুল-শ্যামল সুঠাম,
আমাতেই চির লভিছে বিরাম,
না জানি কতই অতল আরাম
বিহরে এ হিয়া মাঝে।

সম বেদনার চেতনা-পুলকে
সম্বিদ-রূপা আমি;
চিন্ময়ী মম ত্রিদিব-স্বরূপে,
যুগ-যুগান্ত বিহরিছ চুপে,
আমি হে তোমার প্রণয়-বিকার,
তুমি মোর প্রিয় স্বামী।

ভাবিয়া না পাই কতই মাধুরী
আমার এ সারা দেহে;
মম পরশনে তুমি পাও সুখ,
এই সুখে মোর উথলিছে বুক,
বিলাস-কান্তি ভাবমাখা মুখ,
হাসে মোর হিয়া গেহে।

পিয় পিয় বঁধু, অবিরাম মধু
অকূল এ পারাবারে;
পিয় চির-যুগ মিলন বেলায়,
পিয় বিরহের লহর খেলায়,
পিয় সুখে পিয় দুঃখ-বেদনায়
এ সুধা খরচে বাড়ে।

মোসলেম ভারত।

শ্রাবণের "মসলেম ভারত" পেয়েছি। গোড়ায় একটি ছোট মেয়ের আঁকা ছবি—"খেয়া পার"; নজ্‌রুল ইসলাম তার উপযোগী কবিতা লিখেছেন। "ঙয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্"—এর একটা টান আছে; ভগবানের রুদ্র উদ্যতবজ্র রূপ গোড়ায় সাধকের ভাল লাগে। কিন্তু যে আপ্ত যে ভগবানকে পেয়েছে, সে ভীষণের মাঝেও সুন্দরকেই দেখে—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর আর কি ভয় থাকে? পাপ পুণ্য এ সব বঁধুর সঙ্গে চেনাচেনির—অভাবের কথা।

তারপর ভাল জিনিস হচ্ছে নজরুল ইসলামের "বাদল বরিষণে"।—"আমার এই বেদনা বর্ষার সুরে বাঁধা * * "এটা শ্রাবণ মাস, না? আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে।"

এই বর্ষায় ব্যথিত জনের শেষে কাজরীর সঙ্গে দেখা—সে "কাজরিয়া" কালো—শ্যামাঙ্গিনী। প্রথম দর্শনে মন হারান যে কি জিনিস তা' লেখক বেশ বলেছেন—"এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন করে মানুষ এত চির পরিচিত হ'য়ে যেতে পারে?" * * "নীচে শ্যামল দুর্ব্বায় দাঁড়িয়ে বিনুনী-বেণীদোলনে সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান। * * * দেখলাম সেই কালো কাজরিয়া—দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনী নিয়ে চেয়ে আছে।" * * "যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হ'ত না, এক নিমেষে চারটি চোখের অনিমিখ চাউনীতে তা' বলা, হয়ে গেল।"

তারপর মিলনের আশা পেয়ে নিজে কুৎসিত বলে তার কান্না! সে বড় অপূর্ব্ব জিনিস! "ময় কারী কাজরীয়া হুঁ—ওগো সুন্দর, আমি কালো।" রূপহীনার এই বেদনা বড় সুন্দর বেজেছে। এমন আকুল প্রণয়ে মিলন কদাচিৎ হয়, কারণ এত প্রেম যে নিজেই নিবিড়তম মিলন, নিজেই নিজের সার্থকতা। তাই—"সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্তে * * শ্রাবণ প্রাতে ধানের মাঝে বসে গাইছি,—"আমার নয়ন ভুলানো এলে!" তাই এ কাজরী প্রণয়ের পরিণাম হ'লো—"বাদল ভেজা তারই স্মৃতি।"

তরিকুল আলমের লিখিত "আমাদের শিক্ষা সমস্যা" ভাববার জিনিস। তবে তিনি নূতন কাউন্সিলের দেশী বিদ্যার্থীদের শিক্ষা-চক্র গড়বার যে অপূর্ব্ব চিত্রটি দিয়েছেন, তা' সম্ভব হ'ত যদি দেশে শিক্ষার আসল ফলটা—চরিত্র বা মনুষ্যত্ব গঠন হ'তো। মানুষের অন্তর বাদ দিয়ে Soulless শিক্ষার প্রতিকারের জন্য দু'একটি অনুষ্ঠান কেউ যদি গড়তে পারে, তা' হ'লে অমন কর্ম্মীর দল পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছেলে ঐ সব ননীর পুতুলদের দ্বারা অত খাটুনী সম্ভব নয়।

হেমলতা দেবীর "বোঝা বওয়া" অপূর্ব্ব সামগ্রী। এমন বেকার প্রেমিক—এমন পরের ভার-তারণ শরণদ মানুষের ছবি যিনি আঁকতে পারেন, তাঁর লেখনী ধন্য। "বোঝা বওয়া" উঁচুদরের গল্প-কবিতা।

সুরেশ চন্দ্রের "নবীনের গান" এবারকার "মনমোন ভারতে" উঁচু

দরের কবিতা। সুরেশ জীবনের সধক—যৌবনসুগন্ধী জাগ্রত-সমাধির সহজিয়া।

তারপর রবীন্দ্রনাথের পত্র আছে, সেই 'বাঁধন হারা'র উজ্জ্বল মাধুর্য্য, আরও অনেক রত্ন এবারকার শ্রাবণ সংখ্যার মণি-কোষে আছে।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়।

কঠোপনিষৎ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল শ্লোক, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুগামী সংক্ষিপ্ত টীকা ও তাৎপর্য্য সম্বলিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম! প্রাপ্তিস্থান লোটাস লাইব্রেরী, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন পক্ষে—মালদহের "গৌড়দূত" হইতে পুনর্মুদ্রিত কতকগুলি প্রবন্ধ সমষ্টি। প্রকাশক শ্রীমদনমোহন দাস, পুরাতন মালদহ। মূল্য ৵৹ আনা।

শ্রীযুক্ত পাটেলের অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় বিল সমর্থন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য। "পাটেল বিল" আইনে পরিণত হইলে যে হিন্দু সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, গ্রন্থকার নানাযুক্তি সহকারে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বস্ত্রযজ্ঞ—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য এক আনা। ৪৯।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এম, ধরের নিকট পাওয়া যায়। তুলার চাষ করিয়া, চরকায় সূতা কাটিয়া, তাঁতে তাহা বুনিয়া কিরূপ দেশে বস্ত্রের অভাব দূর করা যায় পুস্তিকাখানিতে তাহাই বিচারিত হইয়াছে।

গ্রামের উন্নতি—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ৪৯।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ॥৹ আট আনা।

আমাদের দেশের পল্লীগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার নানা কারণ; তবে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও অমনোযোগ যে একটী প্রধান কারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে দেশে শতকরা ৮০ জন গ্রামবাসী—সে দেশে গ্রামগুলিকে উন্নত না করিয়া দেশের মঙ্গল চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পল্লীগ্রাম-

বাসীর যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য (যেমন জলের বিশুদ্ধতা রক্ষণ, গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী, খাদ্যাখাদ্যের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা, সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়) সেইগুলি গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সদুদ্দেশ্য সফল হইলে আমরা সুখী হইবে।

তিলকের তিরোভাব—কর্ম্মবীর স্বর্গীয় মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলকের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ওজস্বিনীভাষায় লিখিত কবিতা। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড, ২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ৵১০।

অর্চ্চনা।—শ্রীজিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক সঙ্গীত গুচ্ছ। প্রাপ্তিস্থান ১৯।২এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১০ আনা।

সরল পশুপালন।—শ্রীহেমন্তকুমার বসু জি, বি, ভি, সি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ৮৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

এ পুস্তকখানিতে গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের বাসস্থান, সাধারণ স্বাস্থ্য, পীড়ার লক্ষণ ও ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার যথাসম্ভব গাছগাছড়া প্রভৃতি দেশী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের দেশে দেবতাজ্ঞানে ফুল দিয়া গো-পূজার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার অভাবে গো-বংশ যে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে, সেদিকে কাহারও বড় একটা দৃষ্টি নাই। সুলভ মূল্যে পুণ্য ক্রয় করিয়াই আমরা স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে ব্যস্ত। এ অবস্থায় এ পুস্তকখানি পড়িয়া ও ইহার উপদেশ অনুধায়ী চলিয়া কৃষক ও অন্যান্য গৃহীরা যদি গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থার একটু উন্নতি সাধনে তৎপর হন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

এবার হইতে আমরা প্রতিমাসে নারায়ণে **অবনীন্দ্র আর্ট স্কুলের ছবি** একখানি করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। তিন রঙে ছবি বড় ব্যয়সাধ্য, তথাপি বন্ধু ও গ্রাহকগণের আনুকূল্যের ভরসায় আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

অগ্রহায়ণ হইতে **বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রের আত্মকথা** আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিক চলিবে।